সাইমুম-৪৮

মাউন্ট আরারাতের আড়ালে

আবুল আসাদ

ইবুক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম

সাইমুম সিরিজকে অনলাইনে টেক্সট আকারে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালের ১৭ই আগস্ট গঠন করা হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট (SSUP) গ্রুপ। তারপর বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুকে প্রোজেক্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন একঝাক স্বেচ্ছাসেবক এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট টীম। টীম মেম্বারদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ৮ মাসে সবগুলো সাইমুম অনলাইনে আসে। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ওয়েবসাইটঃ www.saimumseries.blogspot.com

ফেসবুক পেজঃ www.facebook.com/SaimumSeriesPDF

ফেসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/saimumseries

১

আহমদ মুসা ও সাতজন কমান্ডো এক এক করে অ্যান্টেনার খোলা বেজ মুখ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

প্রথমেই পাথুরে সিঁড়ি।

সিঁড়ির সাত-আটটা ধাপ পেরুতেই একটা দরজার ল্যান্ডিং-এ গিয়ে তারা পৌঁছল।

দেখেই বোঝা গেল, সিঁড়িটা লিফটের আরেকটা দরজা।

দরজাটা পাথরের।

দরজা খোলার চিন্তায় আহমদ মুসা দরজা ও দরজার চারপাশের চৌকাঠের মতো প্রান্তের ওপর চোখ বোলাতে লাগল।

ডান ও বাম পাশের দুই চৌকাঠে ভার্টিক্যালি লম্বা দু'টি করে বাটন দেখতে পেল আহমদ মুসা।

দু'পাশের দু'বাটনেই হিব্রু ভাষায় ওপেন ক্লোজ লেখা। কিন্তু দু'পাশের বাটনের লেখা এক রকমের নয়।

বাঁ পাশের চৌকাঠের লেখা সোজা মানে ওপেন শব্দ ডান দিক থেকে লেখা এবং ক্লোজ শব্দ বাঁ দিক থেকে লেখা, কিন্তু ডান দিকের চৌকাঠে শব্দ দু'টি বাঁ দিক থেকে লেখা।

পেছনে দাঁড়ানো কমান্ডো নেতা মুরাদ আনোয়ারের দিকে ফিরে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'মনে হচ্ছে মুরাদ আনোয়ার, একটা ধাঁধা না ভাঙতে পারলে আমরা দরজা খুলতে পারবো না।'

মুরাদ এগিয়ে এল।

দেখল দুই চৌকাঠের চারটি বাটনকে ও বাটনের লেখাগুলোকে।

ভাবনার ছায়া নামল মুরাদ আনোয়ারের মুখে। ভাবছিল আহমদ মুসাও।

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল।

'কিছু ভেবে পেলে মুরাদ আনোয়ার?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'ধাঁধায় ফেলার জন্যে 'ওপেন' শব্দ সোজা আর উল্টো করে দু'বার লিখেছে। আমার মনে হয়, দুই 'ওপেন' বাটনের একটা চাপলেই আমাদের চাওয়াটা পেয়ে যাব মানে দরজা খুলে যাবে।'

'চাপ দাও, মুরাদ আনোয়ার।' বলল আহমদ মুসা।

মুরাদ আনোয়ার দুই ওপেন বাটনই পরপর নানাভাবে চাপল, কিন্তু পাথরের দরজা যেমন ছিল, তেমনি থাকল।

মুরাদ আনোয়ারের চোখে-মুখে হতাশা ফুটে উঠল। বলল, 'তার মানে ধাঁধার অর্থ এটা নয়। নিশ্চয় আরও জটিল কিছু আছে।' বলেই হঠাৎ থেমে গেল মুরাদ আনোয়ার। তার চোখে-মুখে নতুন ভাবনার আলো। বলল, 'দু'পাশের দুই 'ওপেন'-এ চাপ দেয়ার পর গোপন আরও একটা কমান্ড নিশ্চয় আছে। সেটা খুঁজে বের করতে হবে।'

আহমদ মুসা ভাবছিল।

হঠাৎ তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু'পাশের চৌকাঠের বাটন চারটির ওপর আরও একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলল, 'না, মুরাদ আনোয়ার, তার মনে হয় দরকার হবে না। খুব সহজ একটা গাণিতিক নিয়ম রয়েছে ধাঁধার পেছনে।

দেখ, ‘ক্লোজ’ শব্দ দু’টিই মাইনাস পজিশনে রয়েছে। মাইনাসে মাইনাসে প্লাস। তার মানে, ক্লোজ শব্দের বাটন দু’টি একসাথে চাপলেই দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর দেখ, ‘ওপেন’ বাটন দু’টির একটি প্লাস, অন্যটি মাইনাস পজিশনে। প্লাসে-মাইনাসে মাইনাস। অতএব, ‘ওপেন’ বাটন দু’টি একসাথে চাপলেই আমি মনে করি দরজা খুলে যাবে। চেষ্টা কর মুরাদ আনোয়ার।’

বলে আহমদ মুসা রিভলভার ধরা ডান হাতটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে পেছনে দাঁড়ানো কমান্ডোদের দিকে একবার তাকাল।

বাটন দু’টি পুশ করতে এগিয়ে গেছে মুরাদ আনোয়ার।

লম্বা একটা ‘হিস’ শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াতেই সামনের দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। দেখল, দরজাটা হাওয়া। ওপার থেকে অর্ধডজন স্টেনগান হাঁ করে আছে তাদের দিকে। সবচেয়ে সংগীন অবস্থা মুরাদ আনোয়ারের। তার বুকে রিভলভার চেপে ধরে আছে একজন।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াতেই সে চিৎকার করে উঠল, ‘সবাই হাত ওপরে তোল। না হলে সবাই একসাথে লাশ হয়ে...।’

মুরাদ আনোয়ার আহমদ মুসার বাম দিকে চল্লিশ ডিগ্রী কোণে দাঁড়িয়েছিল। ফলে মুরাদ আনোয়ারের বুকে যে রিভলভার তাক করেছিল, তার বাম পাশ গোটাই আহমদ মুসার সামনে অবারিত।

লোকটি যখন হাত ওপরে তোলার নির্দেশ দিচ্ছিল, তখন পকেটের ভেতরে থাকা আহমদ মুসার রিভলভার উঠে এসেছিল লোকটির মাথা লক্ষ্যে।

কথা শেষ হবার আগেই আহমদ মুসার রিভলভারের গুলি লোকটির বাম কানের পাশ দিয়ে ঢুকে গেল তার মাথায়।

গুলিটা করেই আহমদ মুসা চিৎকার করে উঠল, ‘কমান্ডোজ, গেট চেঞ্জড।’

আহমদ মুসাও কাত হয়ে আছড়ে পড়েছিল মেঝেতে।

আহমদ মুসার আশংকাই সত্য হলো। আহমদ মুসার গুলি লোকটিকে হিট করার সাথে সাথেই ওদের ছয়টি স্টেনগান গর্জন করে উঠেছে।

আহমদ মুসার কমান্ড ছাড়াও ওদের স্টেনগান তাদের টার্গেট করা টের পেয়েছিল আহমদ মুসার সাথী কমান্ডোরা। আত্মরক্ষার জন্যে তারাও শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল। কমান্ডো নেতা মুরাদ আনোয়ারসহ কয়েকজনের দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল। কাঁধে, পাঁজরে লেগে কয়েকজন আহত হলো।

মাটিতে শুয়ে পড়ার আগেই আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলভার বের করে নিয়েছিল এবং ওদের ছয়জনকে টার্গেট করে গুলি করাও শুরু করেছিল।

দু'জন কমান্ডো কাঁধে ও পাঁজরে গুলি খেলেও দুর্ধর্ষ কমান্ডোদের দু'জন মোহাম্মদ পাশা ও সোলেমান পাল্টা আঘাত হানতে মুহূর্ত দেরি করেনি। তার ফলেই শেষ রক্ষা হয়েছিল।

ওদের চারজনকে গুলি করতে করতেই আহমদ মুসার গুলি শেষ হয়ে গিয়েছিল। শেষ দু'জনকে হত্যা করেছিল মোহাম্মদ পাশা ও সোলেমান। তা না হলে নির্ঘাত ব্রাশফায়ারের মুখে পড়ে যেত আহমদ মুসা।

ওদের স্টেনগানধারী ছয়জনের রক্তের স্রোতের মধ্যে থেকে একজন মাথা তুলল। সে হাতের স্টেনগানটির ব্যারেল মরিয়া হয়ে একবার ওপরে তোলার চেষ্টা করল। পারল না। হাত থেকে খসে পড়ে গেল স্টেনগান। সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে সে বলল, 'শয়তান, তোরা আমাদের নেতা, আমাদের বিজ্ঞানীদের ধরেছিস। কিন্তু তোদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। আমাদের 'নীরব' ধ্বংসের দৈত্য 'ডাবল ডি' এবং আমাদের গবেষণা তোরা হাত করতে পারবি না। দেখ, আমাদের সুইসাইড স্কোয়াডের নেতা মাথায় গুলি খেয়ে মরলেও তার হাত তার গলায় ঝোলানো রিমোটের রেড বাটনকে প্রাণপণে চেপে ধরেছিল। মরে গেলেও দেখ চেপে ধরেই আছে। এখনি ডাবল ডি'র সবকিছুসহ গোটা গবেষণাগার ও এই কমপ্লেক্স ধূলো হয়ে যাবে। তার সাথে তোদেরও কবর হবে।'

শেষ কথার সাথে সাথে লোকটির মাথাটি নেতিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল। দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'মোহাম্মদ, সোলেমান, কুইক, আমাদের এখনি বেরুতে হবে এখান থেকে। তবে আমাদের ভাইদের লাশ

কি করে রেখে যাই! তোমরা দু'জন দু'জনকে টেনে নিতে পারবে কিনা? আমি দু'জনকে নিচ্ছি।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা দু'জনকে দুই কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

পেছনে মোহাম্মদ পাশা ও সোলেমান দুই সাথীর লাশ টেনে নিয়ে উঠতে লাগল।

সুড়ঙ্গ-সিঁড়ির মুখ কমিউনিকেশন অ্যান্টেনার পথে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা সাহায্য করল আহত দু'কমান্ডো ভাইকে তাদের সাথীদের লাশ নিয়ে বেরিয়ে আসতে।

আহত দু'সাথী দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

'দম নেবার সময় নেই প্রিয় কমান্ডো ভাইরা। যতটা দ্রুত সম্ভব, আমাদেরকে পাহাড়ের ওপরে উঠে যেতে হবে। এস।'

বলেই আহমদ মুসা দু'সাথীর লাশ আবার কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড়ের ওপরে এগোতে লাগল।

'ভাববেন না ভাই, আমরা পারব আপনাকে ফলো করতে। চলুন।' বলল মোহাম্মদ পাশা ও সোলেমান একসাথেই।

সুড়ঙ্গের সিঁড়ি মুখ থেকে বিশ গজের মতো এগিয়েছে আহমদ মুসারা।

সুড়ঙ্গের মুখ থেকে পনের গজ ওপরে একটা টিলার দেয়াল। সে দেয়াল পার হয়ে আহমদ মুসারা মাত্র পাঁচ গজ এগিয়েছিল। এই সময়ই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো। ভূমিকম্পের প্রবল ধাক্কা খাওয়ার মতো পাহাড়টাও প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল।

বড় কিছুর আশংকায় আহমদ মুসাদের চোখ আপনাতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মুহূর্তে কয়েকবার চিৎকার করে মোহাম্মদ পাশা বলল, 'আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন খালেদ খাকান ভাই। আল্লাহর হাজার শুকরিয়া।'

'আলহামদুলিল্লাহ!' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। ওদিকের অবস্থা দেখার জন্যে কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে টিলাটার ওপর দিয়ে ওদিকে নজর ফেলতেই চমকে উঠল। টিলাটার ওপারে পাহাড়ের অবশিষ্ট অংশসহ সবকিছু হারিয়ে গেছে। প্রশস্ত গভীর অন্ধকার খাদ শুধু সামনে।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মোহাম্মদ পাশা এবং সোলেমানও।

'মনে হয়, রিমোটের এ্যাকশন ডাইরেক্ট ছিল না। রিমোটকে এক বা একাধিক ম্যাকানিজমের চেইন্ড রিএ্যাকশনকে অ্যাকটিভেট করতে হয়েছিল। তার জন্যে কমপক্ষে বেশ কয়েক মিনিট বরাদ্দ ছিল। সেই সময়টুকুতেই আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়েছেন।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, হঠাৎ এভাবে ওরা সবকিছু ধ্বংস করল কেন?' বলল মোহাম্মদ পাশা।

'নিশ্চয় ওদের কাছে নির্দেশ এসেছিল। ওদের নেতা ও বিজ্ঞানী যাদের আমরা ধরেছি, তাদের কাছ থেকে কিংবা অন্যদিক থেকে তারা চূড়ান্ত নির্দেশ পেয়েছিল। তার ফলেই আমরা ব্যর্থ হলাম ওদের ধ্বংসের দৈত্য ও গবেষণাগার হাত করতে।'

আহমদ মুসার মোবাইল বেজে উঠল।

ওপার থেকে জেনারেল মোস্তফার উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা গেল, 'মি. খালেদ খাকান, আপনারা কোথায়? ভালো আছেন আপনারা?' আর্ত-চিৎকারের মতো শোনাল জেনারেল মোস্তফার কণ্ঠ।

'ভয় নেই জেনারেল, আমরা নিরাপদ আছি। ঠিক সময়ে আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি। ভেতরের ওরা বাইরে থেকে মেসেজ পেয়েছে। আমরা যাদের ধরেছি, তারা কি কোন মেসেজ পাঠিয়েছে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'স্যরি মি. খালেদ খাকান। ওদের শীর্ষ বিজ্ঞানী আব্দুর রহমান আরিয়েহের গোপন দ্বিতীয় মোবাইলটা তার কাছে রয়েই গিয়েছিল। সেই মোবাইলেই উনি ওদের কাছে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। বিস্ফোরণের পর উনিই চিৎকার করে বিষয়টি আমাদের জানিয়েছেন। হেসে বলেছেন, 'অন্তত, আমাদের

নীরব ধ্বংসের দৈত্য এবং আমাদের গবেষণা আমরা তোমাদের হাতে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারলাম।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'বললেন না ওকে যে, আপনাদের নীরব ধ্বংসের দৈত্যকে আপনারা ধ্বংস করে ভালো করেছেন। ওর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। আমরা মানবতাকে ধ্বংস নয়, রক্ষা করতে চাই। সেই রক্ষার অস্ত্রই হলো আমাদের 'সেভিয়ার অব ওয়ার্ল্ড র‌্যাশনাল ডোমেইন (সোর্ড)'। আমরা আমাদের 'সোর্ড'কে রক্ষা করতে পেরেছি। দানবের বিরুদ্ধে মানবতার জয় হয়েছে।'

'বলব মি. খালেদ খাকান! আপনারা আসুন।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'স্যরি জেনারেল। আপনাকে বলা হয়নি। আমরা কমান্ডো নেতা মুরাদ আনোয়ারসহ চারজনকে হারিয়েছি। কমান্ডো মোহাম্মদ পাশা ও সোলেমান মারাত্মক আহত। আমি ওদের নিয়ে পাহাড়ের ওপরে আছি। চার ভাইয়ের লাশও আমাদের সাথে আছে। প্লিজ একটা হেলিকপ্টার পাঠান।' বলল আহমদ মুসা।

'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বড় দুঃসংবাদ মি. খালেদ খাকান। আল্লাহর অশেষ প্রশংসা, আরও ক্ষতির হাত থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন। আমি হেলিকপ্টার নিয়ে আসছি মি. খালেদ খাকান।'

কথা শেষ করেই জেনারেল মোস্তফা বলল, 'একটু ওয়েট প্লিজ মি. খালেদ খাকান, প্রধানমন্ত্রীর টেলিফোন এসেছে।'

দু'মিনিটেই জেনারেল মোস্তফা টেলিফোনে ফিরে এলেন। বললেন, 'মি. খালেদ খাকান, প্রধানমন্ত্রী তার এবং প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা আপনার সাথে দেখা করতে চান। সব শুনতে চান আপনার মুখ থেকে।'

'তাদের ধন্যবাদ। আমি তাদের সাথে দেখা করার জন্যে উদগ্রীব। তাহলে আসুন জেনারেল মোস্তফা।'

আহমদ মুসা সালাম দিয়ে কল অফ করল।

আহমদ মুসা ডিনার শেষে গোল্ড রিজর্টের দক্ষিণ বারান্দায় এসে বসল। গা এলিয়ে দিল ইজি চেয়ারে।

মর্মর সাগরের স্নিগ্ধ বাতাস সেখানে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে।

আহমদ মুসার দৃষ্টি তোপকাপি প্রাসাদের প্রান্ত পেরিয়ে মর্মর সাগরের ওপর নিবদ্ধ। মর্মর সাগরের কালো বুকের ওপর দিয়ে বসফরাসের আলোকোজ্জ্বল ব্রীজের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছে।

এই অপরূপ দৃশ্য দেখতে গিয়ে মুহূর্তে কয়েকশত বছর আগে ছুটে গেল তার মন। জীবন্ত রূপ নিয়ে এলো তুরস্কের বিশ্ব কাঁপানো সুলতানদের স্মৃতি। তুরস্কের মহান সুলতান বায়েজিদ, সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ, সুলতান সোলেমান দি ম্যাগনিফিসেন্টরাও মর্মর সাগর আর বসফরাসকে এভাবেই দেখতেন। সেই মর্মর সাগর আছে, বসফরাস আছে, তোপকাপি প্রাসাদ আছে, কিন্তু নেই তারা, নেই সেই সময়, নেই তুরস্কের সেই দিন। ইউরোপের অর্ধেক এবং ভূমধ্যসাগর জুড়েও ওড়ে না আর ইসলামের অর্ধচন্দ্র পতাকা।

ভাবতে গিয়ে একটা আবেগ আচ্ছন্ন করে ফেলল আহমদ মুসাকে। দু'চোখের কোণ তার ভারী হয়ে উঠল অশ্রুতে।

জোসেফাইন এসে বসল তার পাশের ইজি চেয়ারে।

আহমদ মুসা চিন্তায় মগ্ন থাকায় তা টের পেল না।

জোসেফাইন ধীরে ধীরে হাত রাখল আহমদ মুসার কাঁধে। বলল আস্তে আস্তে, 'এত বড় কাজের পর কোন ভাবনায় আবার নিজেকে এমন হারিয়ে ফেলেছ?'

ধীরে ধীরে আহমদ মুসা মুখ ঘোরাল জোসেফাইনের দিকে। কাঁধ থেকে জোসেফাইনের হাত নিজের দু'হাতের মুঠোয় ধরে ওপরে তুলে নিয়ে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল, 'ভাবনায় নয়, অতীতের এক সুখ-স্মৃতিতে হারিয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, তুরস্কের অমর বিজেতা সুলতান সোলেমান দি ম্যাগনিফিসেন্ট এবং বায়েজিদদের কথা। আলোর মেঘমালায় সাজানো মর্মর সাগর ও বসফরাসের কালো বুকের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, আমি যেন তাদের চোখেই মর্মর আর

বসফরাসকে দেখছি। ভেসে উঠেছিল আমার চোখে মর্মর আর বসফরাসের সে স্বর্ণালী দৃশ্য।'

'স্যরি, তোমাকে এক দরিদ্র বাস্তবতায় এভাবে ফিরিয়ে আনার জন্যে। তুমি যাকে সুখ-স্মৃতি বলছ, তা সুখ-স্মৃতি মাত্র নয়, আসলে এক টনিক, এক গাইড, এক পাওয়ার জেনারেটর। এ আমাদের সামনে এক 'ভিশন' তুলে ধরে, সামনে এগোবার ক্ষমতা দেয়।' বলল জোসেফাইন।

'তোমার সব কথা ঠিক জোসেফাইন। কিন্তু সুখ-স্মৃতিকে সংগ দেবার সময় আমাদের খুব কম। তুমি আমার সময় বাঁচিয়েছ।' আহমদ মুসা বলল।

'সময় বাঁচানোর প্রশ্ন আসছে কেন? তোমাদের এখানের কাজ শেষ। আপাতত হাতে তো প্রচুর সময়।' জোসেফাইন বলল।

'হ্যাঁ, হঠাৎ করেই যেন শেষ হয়ে গেল। ওরা সবাই এভাবে ধরা পড়বে, তা ভাবা যায়নি। এখানে তোমার বান্ধবীর কৃতিত্ব অনেক বেশি। এই ঠিকানার সন্ধান তার কাছ থেকেই তুমি দিয়েছিলে। আমি ভাবছি তাকে একটা বড় পুরস্কার দেয়া যায়। কি দেয়া যায় বলো তো। আমি তুরস্ক সরকারকে বলব।'

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল, মুখ গম্ভীর হলো জোসেফাইনের। তাতে বেদনার ছাপ। বলল, 'সে সুযোগ পাবে না, সে সুযোগ সে তোমাদের দিল না।'

আহমদ মুসাও সোজা হয়ে বসল। বলল, 'বুঝলাম না জোসেফাইন। সে সুযোগ পাবো না কেন?'

'তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। সে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাচ্ছে। সে আজ রাতের ফ্লাইট ধরছে।' বলল জেসেফাইন।

'হঠাৎ এভাবে চলে যাচ্ছেন? তুমি তো টেলিফোনে তখন কিছু বলোনি। জানতে কি আগে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমি জানতাম না। সেও আমাকে তখন টেলিফোনে কিছু বলেনি। সন্ধ্যায় আমি আয়েশা আরবাকানকে নিয়ে বাগানের দিকে বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসে গেটম্যানের কাছে একটা এনভেলাপ পেলাম। চিঠিটা নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের

একজন মেসেঞ্জার এসে দিয়ে গেছে। ঘরে এসে এনভেলাপ খুলে দেখি জেফি জিনার চিঠি। ওতেই পড়লাম, সে আজ চলে যাচ্ছে মায়ের অসুখের খবর পেয়ে।'

কথা শেষ করেই জোসেফাইন উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এনভেলাপটা এখানেই ঐ শোপিসটার ওপরে রেখেছি।'

বলে জোসেফাইন গিয়ে দেয়ালের শোপিসের ওপর থেকে এনভেলাপ এনে তা থেকে চিঠি বের করে আহমদ মুসার হাতে দিল। বলল, 'পড়ে দেখ। দুঃখজনক যে, সে তার আমেরিকার ঠিকানা চিঠিতে দেয়নি। ভুলেও যেতে পারে তাড়াহুড়োয়।'

চিঠি হাতে নিয়েই পড়তে শুরু করল আহমদ মুসা।

শুরুতেই চিঠিতে জোসেফাইনকে সম্বোধন করেছে 'আপা' বলে। তারপর লিখেছে, 'বন্ধু নয়, 'আপা' বলেই সম্বোধন করলাম।' এই এক বাক্য পড়তেই চিন্তার কোথায় যেন হোঁচট লাগল আহমদ মুসার। এরকম একটা বাক্য কোথায় যেন পড়েছে তার মনে হলো।

আবার পড়তে শুরু করল, 'আপা, আম্মার অসুস্থতার খবর পেয়ে হঠাৎ আমাকে আমেরিকা ফিরতে হচ্ছে। তোমাকে টেলিফোন করেছিলাম, না পেয়ে খবরটা জানানোর জন্যে চিঠির আশ্রয় নিতে হলো। তোমাকে এভাবে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। তার চেয়ে বড় কষ্ট হচ্ছে ছোটমণি আহমদ আবদুল্লাহকে আর দেখতে পাবো না বলে। কারও মায়ার বাঁধন আবারো আমাকে এভাবে বাঁধবে, এটা ভাবিনি। এটা আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

বুঝেছি আপা, এটাই দুনিয়া। এই দুনিয়ায় হাসির চেয়ে কান্নাই সম্ভবত বেশি আছে। আবার ব্যাপারটা এমনও হতে পারে যে, মানুষ 'জন্ম'র আনন্দের চেয়ে মৃত্যুর বেদনাকেই বড় করে দেখে। যেমন সুখ-স্মৃতির চেয়ে, দুঃখের স্মৃতিই মানুষের মনে থাকে বেশি। এরপরও বলব, দুনিয়ার সেরা মহাকাব্যগুলোর অধিকাংশই বিয়োগান্তক। এই বিশ্বচরাচরে হাসির বন্যার চেয়ে কান্নার প্লাবন আসলেই বড়।

স্যরি, বিদায়ের সময় এসব কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। আমার মনে হয়, তুরস্কে তোমাদের মিশন শেষ। এরপর তুমি ঘরে ফিরবে, না নতুন কোন মিশনে, নতুন কোথাও যাবে- আমি জানি না। তবে যেখানেই থাক, যেখানেই থাকি, এক পৃথিবীতেই আমরা থাকব, এটাই সান্ত্বনা।

কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে, সেটা অনিচ্ছাকৃত। মাফ করে দিও। আমার ছোটমণিটার জন্যে অনেক দোয়া, অনেক ভালোবাসা।'

চিঠি পড়া শেষ হলো আহমদ মুসার। চিঠির কথাগুলো তার মনে অনেক জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলল। চিঠির কথায়, চিঠির ভাষায় একটা পরিচিত মনের ছোঁয়া যেন লাগছে।

চিঠির শেষে নাম স্বাক্ষরের ওপর নজর পড়ল আহমদ মুসার। স্বাক্ষরে দু'টি শব্দ 'জেফি জিনা'। নামের অক্ষর লেখার, বিশেষ করে 'জে', 'এফ,' 'এন' অক্ষরগুলোর স্টাইলের ওপর নজর পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। তার স্মৃতির দুয়ার যেন এক ধাক্কায় খুলে গেল। বিস্ময়-দৃষ্টি নিয়ে চিঠির লেখার ওপর আবার নজর বোলাল দ্রুত। জেফি জিনা নয়, সব ছাপিয়ে আরেকটা নাম যেন কথা বলে উঠল।

বিস্ময়-দৃষ্টি নিয়ে তাকাল আহমদ মুসা জোসেফাইনের দিকে। বলল, 'জোসেফাইন, এ চিঠি কি জেফি জিনার? জেফি জিনা কে?'

আহমদ মুসার জিজ্ঞাসার সুরে জোসেফাইনের চোখেও বিস্ময় ফুটে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, চিঠি তো জেফি জিনার। কেন, জেফি জিনা তো জেফি জিনাই!' জোসেফাইন কৌতুহল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

'কিন্তু জোসেফাইন, আমি নিশ্চিত, এই চিঠির লেখা ও ভাষা দুই-ই সারা জেফারসনের।'

'সারা জেফারসনের!' শব্দটা জোসেফাইনের কণ্ঠ ভেদ করে একটা প্রবল উচ্ছ্বাসের তোড়ে যেন বেরিয়ে এলো।

ছুটে এসে সে আহমদ মুসার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসল। চিঠিটা আহমদ মুসার হাত থেকে নিয়ে তাতে চোখ বোলাল। তারপর ছুটে ঘরের ভেতরে চলে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যে বেরিয়ে এলো। হাতে একখণ্ড কাগজ।

আবার গিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসল জোসেফাইন আহমদ মুসার পাশে। বলল, 'তোমার কাছে পাঠানো সারা জেফারসনের চিঠি নিয়ে এলাম। এস তো দেখি, চিঠি দু'টি মিলিয়ে।'

চিঠি দু'টি পাশাপাশি রেখে দু'জনেই দেখল। জোসেফাইন প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'ঠিক, সারা জেফারসনের লেখা এটা। তার মানে, জেফি জিনাই সারা জেফারসন।'

বলেই জোসেফাইন আহমদ মুসার উরুতে মুখ গুঁজল।

কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলল।

অশ্রুতে ধুয়ে গেছে তার মুখ। বলল, 'এত ঘনিষ্ঠ, এত আপন হয়েও সে পরিচয় গোপন করল? আমার যে কত আশা ছিল তার দেখা পাওয়ার, তার সাথে কথা বলার! আমাকে বড় বোন ডেকে আবার এতটা নিষ্ঠুর হলো সে!'

কথা বলার সাথে সাথে তার দু'চোখ থেকে দু'গণ্ড বেয়ে নেমে এল অশ্রুর ধারা।

আহমদ মুসা তাকে কাছে টেনে নিল। বাম বাহুর মধ্যে তাকে জড়িয়ে রেখে বলল, 'তোমার আবেগ, তোমার কথা ঠিক আছে। আমিও দারুণ বিস্মিত হয়েছি এভাবে তার পরিচয় গোপনে। আমার বিস্ময়ও ঠিক আছে। কিন্তু তার দিকটা ভাব। সে তার দিক থেকে ঠিকই করেছে। তার সেই চিঠিটা আবার পড়ে দেখ।'

জোসেফাইন মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে-মুখে প্রতিবাদের চিহ্ন। বলল, 'না, সে ঠিক করেনি, তার চিঠি আমার মুখস্থ। ভালোবাসা পাপ নয় যে সে অপরাধীর মত পালিয়ে বেড়াবে। কেন সে নিজেকে অপরাধী ভাববে? অপরাধী নয় সে।'

কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল জোসেফাইনের শেষ কথাগুলো।

ম্লান হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তোমার কথা নীতিগত দিক দিয়ে ঠিক জোসেফাইন। কিন্তু তুমি একবার তার জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখ, তুমি যা সহজ মনে করছ তা সহজ নয়। তার জন্যে বিষয়টি কষ্টকর আর আমাদের জন্যে বিব্রতকর। সে এটাই এড়াতে চেয়েছে।'

কোন উত্তর দিল না জোসেফাইন। চোখ মুছে মাথা নিচু করল।

একটু পর মাথা নিচু রেখেই স্বগতঃকণ্ঠে বলল জোসেফাইন, 'সে পরিচয় দিয়েই দেখতো, আমাদের বিব্রতভাব ও তার কষ্ট দূর করতে পারতাম কিনা!'

বলে মুখ তুলল জোসেফাইন। বলল, 'আমাকে একটা অনুমতি দেবে?'

আহমদ মুসা তাকাল জোসেফাইনের দিকে। বলল, 'অনুমতির প্রশ্ন কেন? তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট। বল?'

'আমি আমেরিকা যাব।' বলল জোসেফাইন আহমদ মুসার দিকে চোখ তুলে।

মুহূর্তের জন্যে একটা বিস্ময়ের ঝলক খেলে গেল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। একটু ভাবল। অস্পষ্ট এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল, 'তুমি সারা জেফারসনকে জবাব দিতে চাও?'

জোসেফাইনের চোখে-মুখে গাম্ভীর্যের সাথে একটা দৃঢ়তা ফুটে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, তাকে জবাব দিতে চাই। সে যেভাবে নির্বাক-বিস্ময়ে পীড়িত করেছে, আমিও তাকে ঠিক সে নির্বাক-বিস্ময়ে অভিভূত করব।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'শুধু এ জন্য তুমি আমেরিকা পর্যন্ত ছুটবে?'

হাসল জোসেফাইন। বলল, 'হ্যাঁ, বলারও কিছু আছে। সে যে পরিস্থিতিতে যেভাবে ভালোবেসেছে, সেটা অন্যায় নয়, অপরাধ নয়। কেন সে তাহলে পালিয়ে বেড়াবে? কেন স্বাভাবিক বিষয়টা সহজভাবে বলতে পারবে না? কেন সে অসহনীয় এক কষ্টে দগ্ধ হবে?'

হাসি দিয়ে কথা শুরু করেছিল জোসেফাইন। কিন্তু শেষে তার কণ্ঠ আবেগের উচ্ছ্বাসে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল।

জোসেফাইনের আবেগ-রুদ্ধ কথা আহমদ মুসাকেও স্পর্শ করেছিল। তার মুখে নেমে এল বিষণ্নতার একটা ছায়া। বলল গম্ভীর কণ্ঠে, 'এসব বলে কতটা লাভ হবে জোসেফাইন? তোমার যুক্তি ঠিক। কিন্তু তার কাছে যেটা বাস্তবতা, সেটা কি সে ডিঙাতে পারবে? তাকে তার মত করে থাকতে দেয়াই ঠিক নয় কি জোসেফাইন?' নরম কণ্ঠ আহমদ মুসার।

ম্লান হাসল জোসেফাইন। বলল, ‘এসব কি আমাকে যেতে না দেয়ার যুক্তি তোমার?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তোমার ইচ্ছাই আমার অনুমতি জোসেফাইন। আমি যা বললাম, সেটা তোমার কথার পাশে আমার কথা মাত্র।’

‘ধন্যবাদ।’ বলল জোসেফাইন হাসিমুখে।

‘যাওয়া সম্পর্কে তোমার পরিকল্পনা কি?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পরিকল্পনাটা তুমিই করে দেবে। মদীনা শরীফে ফিরে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।’

বলে জোসেফাইন উঠে ইজি চেয়ারটা টেনে আহমদ মুসার চেয়ার ঘেঁষে তা সেট করে গা এলিয়ে দিল ইজি চেয়ারে এবং বলল, ‘আমাদের তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। তার পরিচয় জানার পর এটা অপরিহার্য হয়ে গেছে।’

‘পরিচয় জানার আগেও এটা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু সুযোগ পাইনি। তুমি যাচ্ছ, আমার পক্ষ থেকে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবে।’

হাসল জোসেফাইন। বলল, ‘আমার কৃতজ্ঞতা আমি জানাব। দরকার বোধ করলে তোমার কৃতজ্ঞতা তুমি জানিও।’

‘তোমার কৃতজ্ঞতা কিসের? তুমি না ঝগড়া করতে যাচ্ছ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঝগড়া যে কারণে, সে কারণে ঝগড়া তো হবেই। কৃতজ্ঞতার কারণ ভিন্ন।’ বলল জোসেফাইন।

‘কৃতজ্ঞতার কি কারণ?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমার স্বামীকে সে সাহায্য করেছে, একাধিকবার বড় বড় বিপদ ও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে, বিশাল এক দায়িত্ব পালনে আমার স্বামীর যে সাফল্য, তা তার সাহায্যেরও ফল।’ বলল জোসেফাইন। কথার শেষ দিকে কান্নায় তার চোখ ভিজে উঠেছিল।

আহমদ মুসার মুখও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তারও চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার আলো। বলল, ‘ঠিক বলেছ জোসেফাইন। তার সাহায্যগুলো ছিল অমূল্য, অকল্পনীয়ভাবে তা পেয়েছি। তার প্রতিটি সাহায্যই ছিল আমাদের সাফল্যের এক

একটা করে টার্নিং পয়েন্ট। তখন বিস্মিত হয়েছি। মাঝে মাঝেই ভেবেছি, সে তাদের ঘনিষ্ঠদের মধ্যেকার কেউ ভালো একজন হবেন। কিন্তু সারা জেফারসনের পরিচয় পেয়ে আরও বিস্মিত হচ্ছি, সে তাদের ভেতরের খবরগুলো এত নিখুঁতভাবে কিভাবে পেত!'

'আমার মনে হয় কি জান, 'স্মার্থা' মেয়েটা 'থ্রি জিরো'র হার্ডকোরের একজন ছিল। স্মার্থা তাদের স্বার্থে গোয়েন্দাগিরি করত আর সারা জেফারসন তার ওপর গোয়েন্দাগিরি করত। আমার মনে হয়, স্মার্থার গতিবিধি সে অনুসরণ করত।' বলল জোসেফাইন।

'কিন্তু এই কাজটা অত্যন্ত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ।' আহমদ মুসা বলল।

'এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজটাই সে তোমাদের স্বার্থে নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে গোপন রেখে করেছে। পরিমাপ করতে পার এই ত্যাগের?' বলল জোসেফাইন।

'এর পরিমাপ আল্লাহ করবেন। তিনিই মাত্র তাকে এর উপযুক্ত জাযাহ দিতে পারেন। নিঃস্বার্থ যে কাজ তা আল্লাহর জন্যেই হয়। সে এটাই করেছে।' ধীর ও শান্ত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল জোসেফাইন আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার কথা শেষ হলেও সংগে সংগে জবাব দিল না জোসেফাইন।

মুহূর্ত কয়েক পর ধীরে ধীরে বলল জোসেফাইন, 'আল্লাহ তো জাযাহ অবশ্যই দেবেন। আল্লাহর বান্দার কাছেও তাঁর প্রাপ্য অবশ্যই আছে। যারা বিনিময় চায় না, তাদের প্রতি দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়।'

'তোমার কথা ঠিক জোসেফাইন। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা শুধু দেয়, নেয় না। তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনকেও তারা সহজে গ্রহণ করে না। সারা জেফারসন হতে পারে সে ধরনেরই মানুষ। তুমি যাচ্ছ। ঘনিষ্ঠ হলে তুমিই ভালো বুঝবে।' আহমদ মুসা বলল।

'তুমি যে ধরনের মানুষের কথা বলেছ, সে ধরনের মানুষ দুনিয়াতে আছে। কিন্তু সারা জেফারসন সে ধরনের মানুষ নয়। তার জীবনের এখন সফলতার শুরু মাত্র। জীবনের সবটাই তার পাবার বাকি। অনেক স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, অনেক কিছুরই কাঙাল সে। আমি দেখেছি, হৃদয়ের সবটুকু

ভালোবাসা দিয়ে আহমদ আবদুল্লাহকে সে জড়িয়ে ধরতো, চুমো খেত পাগলের মত। এটা এক বুভুক্ষু হৃদয়ের পরিচয়। তার সাথে আমার যতবার দেখা হয়েছে, বুকে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। এটা সৌজন্যমূলক নয়। তার বুকে আমি বোনের উত্তাপ পেয়েছি, যা অন্তরঙ্গ, একান্ত আপন। এর মধ্যেও রয়েছে হৃদয়ের শূন্যতা পূরণের প্রয়াস। তোমার এসব বোঝার কথা নয়, বুঝবে না। সুতরাং তার সম্পর্কে কোনও শেষ কথা তুমি বলো না। তার ব্যাপারটা ছেড়ে দাও আমার ওপর।'

'ধন্যবাদ জোসেফাইন। সারা জেফারসন ভালো মেয়ে। অজ্ঞাতেই আমি তার ক্ষতি করেছি। তুমি যদি তাকে সহজ করতে পার, স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পার, তখন সে অতীত ভুলে গিয়ে বর্তমানকে আঁকড়ে ধরবে সানন্দে, তাহলে শুধু আনন্দিত হওয়া নয়, এক অপরাধবোধ থেকেও মুক্তি পাব জোসেফাইন।' বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার কণ্ঠ কিছুটা ভারী হয়েছিল।

জোসেফাইন আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বলল, 'দোয়া কর আমি যেন সফল হই।'

আহমদ মুসার বুক থেকে মুখ তুলে বলল জোসেফাইন, 'ও! ভুলে গেছি। চিঠির সাথে একটা ইন্টারনেট ডকুমেন্ট আছে। সে যখন পাঠিয়েছে, তখন নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু।'

বলেই জোসেফাইন তার ইজি চেয়ারের ওপর থেকে এনভেলাপটি নিয়ে ভেতর থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল। কাগজের ভাঁজ খুলে কাগজটার ওপর নজর বোলাল। তিন পৃষ্ঠার একটা লেখা। ওপরে শিরোনাম: 'গন্তব্য না জানা একটা মেসেজ'। শিরোনামের ওপর হাতের লেখা দু'টি লাইন। হাতের লেখাটা সারা জেফারসনের।

কাগজটি আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'একটা মজার শিরোনামের একটা মেসেজ, তুমি পড়।'

আহমদ মুসা তখন ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ দু'টিও বন্ধ করেছে। বলল, 'তুমিই পড় জোসেফাইন। আমি শুনছি। কার মেসেজ, সারা জেফারসনের?'

‘না। সে ফরওয়ার্ড করেছে মাত্র।’

বলেই জোসেফাইন মেসেজের শেষটা দেখে নিল। বলল, ‘মেসেজটি জনৈক ড. আজদা আয়েশার।’

চিঠিটি হাতে নিয়ে জোসেফাইনও ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। বলল, ‘পড়ছি, শোন।’

‘প্রথমে সারা জেফারসনের ফরওয়ার্ডিংটা পড়ছি। ফরওয়ার্ডিংয়ে সে লিখেছে, ‘প্রিয় জোসেফাইন, ইন্টারনেটে জনৈক ড. আজদা আয়েশার এই মেসেজটি আমি পাই। আমার কাছে মেসেজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। তোমার স্বামী সম্মানিত খালেদ খাকান বিষয়টা আরও ভালো বুঝবেন। তার জন্যেই মেসেজটা পাঠালাম।’

লাইন কয়টা পড়ে একটু থামল জোসেফাইন। বলল, ‘দেখেছ, এই লাইনকয়টাতেও সে নিজেকে কেমনভাবে গোপন করেছে! খালেদ খাকান ছাড়া তোমার আর কোন পরিচয়ই যেন সে জানে না। আর দেখ, ‘তোমার স্বামী’ শব্দ না লিখলেও সে পারত। তার মত ক্ষেত্রে অন্য সবাই ‘তোমার স্বামী’ শব্দ এড়িয়ে যেত, এমন কিছু লেখা তাদের জন্যে কষ্টকর। কিন্তু সারা জেফারসন লিখতে পেরেছে। কারণ, তোমাকে নিয়ে আমার সাথে হিংসা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার লেশমাত্র তার মনে নেই। আশ্চর্য, সে আমাকে হিংসার বদলে বোনের নিবিড় ভালোবাসা দিয়েছে। আর সর্বতোভাবে তোমার থেকে দূরে থেকেছে, সম্পূর্ণভাবে আড়ালে রেখেছে নিজেকে। কত বড় ত্যাগের আদর্শ থেকে এমন মন সৃষ্টি হতে পারে, তা অনেকের জন্যে কল্পনা করাও মুশকিল।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসার কাছ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষা না করে পড়তে শুরু করল মেসেজটা:

‘আমি ড. আজদা আয়েশা। একজন টার্কিশ কুর্দি আমি। আমি জার্মানির বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গত বছর পিএইচডি করেছি ইতিহাসে। তারপর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনার চাকরি করছি। কয়েকমাস আগে আমাদের প্রতিবেশী আর্মেনিয়ার একটা কাগজে বিস্ময়ের সাথে দেখলাম, আমার ছোট ভাই আতা সালাহউদ্দিন মাদক ব্যবসায়ী সন্ত্রাসী হিসেবে বিচারের সম্মুখীন। আমার ভাইয়ের

জন্যে এ এক অকল্পনীয় অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গেই দেশে চলে এলাম। আমার চোখের সামনেই আমার ছোট ভাই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিয়ে কারাগারে ঢুকে গেল। দেখা করলাম কারাগারে তার সাথে। তার রুমে মাদকের প্যাকেট রেখে তাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমার ভাইয়ের কথা আমি বিশ্বাস করি। আমার প্রতিবেশী এক যুবকের ক্ষেত্রে এই একই ঘটনা ঘটেছে। জানলাম, আমার এক ক্লাসমেট এভাবেই জেলে গেছে। আমিও আতংক বোধ করছি। এই তিনজন সম্পর্কেই আমি জানি, এরা মাদকসেবী বা মাদক ব্যবসায়ী হতে পারে না। কেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ? কি আছে এর পেছনে? আমি খোঁজ নেয়া শুরু করি আমার এলাকাসহ মাউন্ট আরারাতের সমগ্র দক্ষিণ এলাকায়। মাউন্ট আরারাতের দক্ষিণে তুরস্কের যে এলাকা বকের ঠোঁটের মত আর্মেনিয়া, নক্সিভ্যাম ও আজারবাইজানের মধ্যে ঢুকে গেছে, সেটাই আরা আরিয়াস। আমার এলাকা। অনুসন্ধানে আমার আরা আরিয়াসসহ এই এলাকায় গত ছয় মাসে দু'হাজার যুবক ঐ একই ধরনের অপরাধে যাবজ্জীবনের জন্যে জেলে গেছে। আমার গোটা এলাকা প্রায় যুবকশূন্য হয়ে গেছে। আরা আরিয়াস সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক পরিবার বিলীন হয়ে গেছে। ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছে তারা। সবচেয়ে বড় কথা হলো, নতুন মুখে ভরে গেছে আমার এলাকা। বহু নতুন পরিবার এসে জেঁকে বসেছে এখানে। এরা তুর্কি পরিবার নয়। ভাষার উচ্চারণে এদের আমি আর্মেনীয় মনে করেছি। আতংকিত হয়ে আমি আরও গভীর অনুসন্ধানে নামি। তাতে আমার দু'টি জিনিস মনে হয়েছে, এক. আসল বিষয় মাদক ব্যবসা বা মাদক নয়, বিষয়টা মাউন্ট আরারাতকে কেন্দ্র করে কিছু। নতুন বসতির বাড়িগুলোর প্রত্যেকটা দরজায় মাউন্ট আরারাতের প্রতিকৃতি। ঐ লোকদের অনেকের বাহুতেই দেখেছি মাউন্ট আরারাতের উল্কি। দুই. মাউন্ট আরারাতের দক্ষিণসহ আরা আরিয়াস কুর্দি যারা স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক, তাদের বিরুদ্ধে নীরব ক্যাম্পেইন চলছে। বলা হচ্ছে, এই দালালদের থাকার অধিকার নেই। উল্লেখ্য, মাদক ব্যবসায়ী সাজিয়ে যাদের জেলে পুরা হচ্ছে, তারাও এই শ্রেণীর। তার ওপর তাদের ক্রিমিনাল হওয়ার অভিযোগ তো আছেই। আমি বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন ও পুলিশের সাথে কথা বলেছি। তারা চোখ বন্ধ করে কথা বলেছে, মাদকের হাত থেকে এলাকাকে

মুক্ত করার জন্যে ক্রিমিনালদের নির্মূল করা হবে। আর নতুন বসতি স্থাপনকারীদের সম্পর্কে আমার কথা শুনে তো তারা আমাকে বোকা ঠাওরেছে। বলেছে, আমি নাকি জার্মানীতে থাকায় দেশের কোন খোঁজ রাখি না। তারা বলেছে, ওরা নতুন আগন্তুক নয়, ওরা তুরস্কের বৈধ আর্মেনীয় নাগরিক। তুরস্ক-আর্মেনিয়া টেনশন ও কুর্দি বিদ্রোহকালীন বিভিন্ন সময়ে তারা আর্মেনিয়ায় চলে যায়। কিছু দিন আগে আর্মেনীয় তথাকথিত গণহত্যা বিষয়কে ফরগিভ এন্ড ফরগেট করার তুরস্ক-আর্মেনিয়া-মার্কিনীদের মধ্যেকার ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে মৈত্রী চুক্তির শর্ত হিসেবে উদ্বাস্তু আর্মেনীয় তুর্কিদের ফেরত নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সুবিধা অনুসারে ওরা ধীরে ধীরে আসছে। তাদের কথা খণ্ডন করার মত যুক্তি আমার নেই। কিন্তু আমি নিশ্চিত, তাদের কথাটাই শেষ কথা নয়। কি করব এ নিয়ে যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন একটা ঘটনা ঘটল। সেদিন আমি বাগানে কাজ করছিলাম। বাগানের বাইরে ছেলেরা খেলছিল। মাঝে মাঝে দু'একজন ছেলে বাগানেও আসছিল বল কুড়ানোর জন্যে। বাগানের গাছঘেরা জায়গায় আমি কাজ করছিলাম। দরজাটা সেখান থেকে গাছের একটু আড়ালে পড়েছে। কাজের সময় নড়াচড়াকালে হঠাৎ আমার নজরে পড়ল নয়-দশ বছরের একটা ছেলে আমার বাড়িতে প্রবেশ করল। তার হাতে একটা থলে। কেন প্রবেশ করল? পানি খেতে? কৌতুহলবশত আমিও ছুটলাম। ড্রইং রুমের দরজা খোলা ছিল। এ দরজা দিয়েই সে প্রবেশ করেছে। আমি ভেতরে ঢুকেই দেখলাম, ছেলেটি সোফার কুশন উল্টিয়ে কি যেন রাখছে। আমি ছুটে গিয়ে দেখলাম, কয়েকটা প্যাকেট কুশনের তলায় রাখা হয়েছে। আমি ধরে ফেললাম ছেলেটিকে। হঠাৎ করেই আমার মনে হলো, প্যাকেটগুলো হেরোইন জাতীয় কোন মাদকের হবে নিশ্চয়। আমি ছেলেটাকে প্যাকেটগুলো হাতে নিতে বলে তাকে পুলিশে দেবার জন্যে নিয়ে চললাম। আমার বাড়ির সামনে রাস্তার বিপরীত দিকেই পুলিশ স্টেশন। আমি বাড়ির সামনের মাঠ পেরিয়ে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তা পার হয়ে থানায় যাবার জন্যে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকজন জমে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে আমার সামনে দাঁড়াল। লাফ দিয়ে কয়েকজন লোক নামল গাড়ি থেকে।

তাদের মুখে মুখোশ। কিছু বুঝে উঠার আগেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে গাড়িতে তুলল। তারপর দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। যে লোকটি আমাকে ধাক্কা দেয়ার জন্যে আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়েছিল, তার বাহুতে মাউন্ট আরারাতের উল্কি দেখেছি। প্রত্যক্ষদর্শী লোকজন নিয়ে আমি থানায় গেলাম। থানা আমাকে হতাশ করল। পুলিশ উল্টো অভিযোগ করল, ওরা আপনার ভাইয়ের দলেরই লোক। আপনার বাড়িতে রাখা অবশিষ্ট মাদকের প্যাকেটই তারা নিতে এসেছিল। আমরা দলটাকে খুঁজছি। বিষয়টির গভীরে যেতে চায়নি পুলিশ। ওইদিনই সন্ধ্যায় আমার ড্রইংয়ে ঢোকা সেই ছেলেটির লাশ পাওয়া গেল একটা রাস্তার পাশে। সম্ভবত ধরা পড়ার শাস্তি পেয়েছে ছেলেটি। এই ঘটনা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, আমার বাড়িতে মাদক রেখে আমাকেও জেলে পুরতে চেয়েছিল। আরও বুঝেছি, এই মাদকের সয়লাব গভীর কোন ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার। কিন্তু জানি না সেই ষড়যন্ত্র কি? ষড়যন্ত্রকারীদের বাহুতে মাউন্ট আরারাতের উল্কি কেন? এই উল্কি আবার নতুন বসতি স্থাপনকারীদের দরজায় কেন? জানার জন্যে আমি আর কিছু করতেও পারব না। একবার বিপদ থেকে বেঁচেছি। আরও কি বিপদ অপেক্ষা করছে কে জানে! এই দুর্দিনে সাহায্য করার কাউকে দেখছি না, আল্লাহ ছাড়া। তাঁর ওপর ভরসা করেই আমাদের জনগণের এই বিপদ বার্তাটি ইন্টারনেটে ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লাহই একে তার ঠিকানায় পৌঁছাবেন, এই আশায়।'
–ড. আজদা আয়েশা, আরা আরিয়াস, টার্কি।

মেসেজটি পড়া শেষ হলো জোসেফাইনের।

চিঠিটা পাশে রেখে তাকাল জোসেফাইন আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসেছিল ইজি চেয়ারের ওপর।

জোসেফাইনের পড়া শেষ হলেও আহমদ মুসা কথা বলল না। ভাবছিল সে। কোথায় যেন মাউন্ট আরারাতের উল্কি সে দেখেছে। হঠাৎ মনে পড়ল, আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভেনের একটা আর্কাইভে একটা প্রাচীন বইয়ে শামিল তাকে আরারাতের উল্কিওয়ালা মানুষ দেখিয়েছিল। বলেছিল, এরা ছিল আর্মেনিয়ার একটা বিপজ্জনক গ্রুপ। বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক হোয়াইট ওলফের

চেয়ে শতগুণ বেশি হিংস্র ওরা। ওরা নিজেদের মনে করে বাইব্লিক্যাল আর্মেনিয়ার সৈনিক। আর মাউন্ট আরারাত ওদের বেথেলহেম।

এই স্মৃতির মধ্যে আহমদ মুসা গভীরভাবে ডুবে গিয়েছিল।

জোসেফাইন কিছুটা অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে বলল, 'অন্য কিছু ভাবছ তুমি?'

চোখ ফিরিয়ে আহমদ মুসা তাকাল জোসেফাইনের দিকে। বলল, 'অন্য কিছু নয়। অনুরূপ একটা অতীতের স্মৃতি নিয়ে ভাবছিলাম।'

আহমদ মুসা ইয়েরেভেনের আর্কাইভে দেখা আরারাতের উল্কিওয়ালা সেই বিপজ্জনক লোকদের সম্পর্কে শামিলের কাছে যা শুনেছিল তা বলল।

জোসেফাইন বলল, 'সেই উল্কিওয়ালারা আর এই উল্কিওয়ালারা কি এক?' তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'আমি জানি না। এক হলে সেটা বিপজ্জনকই হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ওরা কি চায়?' জোসেফাইন বলল।

'এ সম্পর্কে এখনও কিছু শুনিনি। ড. আজদাও তার মেসেজে এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু লেখেনি।' বলল আহমদ মুসা।

জোসেফাইন কিছু বলল না। সে ভাবছিল, আজদার চিঠিতে বিষয়টাকে ততটা ভয়াবহ মনে হয়নি, কিন্তু আহমদ মুসা উল্কিওয়ালাদের যে পরিচয়ের কথা বলল, তাতে বিষয়টা একটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে বলা যায়। এই সাথে একটা উদ্বেগ জোসেফাইনের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তার মানে আহমদ মুসা ড. আজদার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে! বুকের কোথায় যেন একটা প্রবল অস্বস্তি মুখ তুলল। জোসেফাইন আশা করেছিল, এ মিশন শেষ করে তারা একসাথে মদিনায় ফিরছে। আহমদ মুসার রেস্ট দরকার। তার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে।

জোসেফাইনের চিন্তা শেষ হলো না।

আহমদ মুসার কথায় তার চিন্তায় ছেদ নামল।

'তুমি কি ভাবছ জোসেফাইন ড. আজদা আয়েশার মেসেজ নিয়ে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

বুকের কোথায় যেন মুহূর্তের জন্যে সামান্য কাঁপুনি উঠল। কি উত্তর দেবে সে! যে কথা সে বলতে চায়, সে কথা সে বলতে পারে না। এতটা স্বার্থপর সে হবে কেমন করে! তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'তুমি যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমি তার সাথে আছি।'

'এতে কিন্তু তোমার মতের প্রকাশ ঘটল না।' বলল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি।

মুখ গম্ভীর হলো জোসেফাইনের। বলল, 'বিষয়টা গ্রহণ করার মত না হলে সারা জেফারসন মেসেজটা তোমাকে দিত না। মেসেজটা পড়ার পর গুরুত্ব সম্পর্কে আমার দ্বিধা ছিল, কিন্তু তোমার কাছে উল্কিওয়ালাদের পরিচয় জানার পর আমার মনে হচ্ছে, আমাদের জানা এই বিষয়গুলো কোন বিশাল ষড়যন্ত্র বা ঘটনার আইসবার্গ মাত্র এবং সেহেতু ড. আজদার আহ্বানে সাড়া দেয়া অপরিহার্যই মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

হাসল আহমদ মুসা। হাত বাড়িয়ে জোসেফাইনের একটা হাত তুলে নিল নিজের দু'হাতের মুঠোয়। বলল, 'ধন্যবাদ জোসেফাইন। তুমি যখন কোন কিছুর পক্ষে যুক্তি দাও, তখন সেটা গ্রহণ করা আমার জন্যে শুধু আনন্দের নয়, তা আমার জন্যে শক্তির উৎসও হয়ে দাঁড়ায়। ধন্যবাদ জোসেফাইন তোমাকে।'

বলে জোসেফাইনকে কাছে টেনে নিল আহমদ মুসা।

জোসেফাইন স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বলল, 'তোমার বিশ্রাম দরকার ছিল, তা হলো না। সবই আল্লাহর ইচ্ছা।'

'ভেব না জোসেফাইন। কাজে আমি আনন্দ পাই। আনন্দই বিশ্রাম।' বলল আহমদ মুসা।

'আনন্দ সবটুকু নয়। রাতের নীরবতা ও ঘুম আল্লাহ দিয়েছেন বিশ্রামের জন্যেই।' জোসেফাইন বলল।

'আনন্দ ও রাত দুটোই আমার সাথে থাকছে জোসেফাইন।' বলল আহমদ মুসা।

'থাকছে না কিন্তু জোসেফাইন।' বলে হেসে উঠল জোসেফাইন।

‘এমন সাময়িক বিচ্ছেদ আকর্ষণ বাড়ায়।’ বলে হেসে উঠল আহমদ মুসাও।

‘আর আকর্ষণ বাড়াতে চেও না, তাহলে ছুটি মিলবে না।’ বলে জোসেফাইন আহমদ মুসার বাহুবন্ধন থেকে বেরিয়ে ছুটে ঘরে ঢুকে গেল হাসতে হাসতে। বলল একটু স্বর চড়িয়ে, ‘ওঠো না, কফি আনছি।’

প্রেসিডেন্ট হাউজ থেকে একটি মার্সিডিজ আহমদ মুসাকে নিয়ে বের হচ্ছিল বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে।

আহমদ মুসা ও জোসেফাইন পাশাপাশি বসেছে। তাদের পেছেনের সীটে বসেছে লতিফা আরবাকান আহমদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে।

‘ম্যাডাম জোসেফাইন, ব্যালকনিতে মাননীয় প্রেসিডেন্ট ও ম্যাডাম দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন।’ বলল পেছন থেকে লতিফা আরবাকান।

লতিফা আরবাকান আহমদ মুসাদের সাথে যাচ্ছে প্রেসিডেন্টের স্ত্রীর নির্দেশে। আহমদ মুসা মাউন্ট আরারাত অঞ্চলে যাওয়ার জন্যে ভ্যানলেক বিমানবন্দরে নেমে যাবে। লতিফা আরবাকান জোসেফাইনের সাথে মদিনা শরীফ যাবেন। জোসেফাইন যতদিন চাইবেন লতিফা আরবাকান তার সাথে থাকবেন। আহমদ আব্দুল্লাহর খুব ভাব হয়েছে লতিফা আরবাকানের সাথে।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা ও জোসেফাইন দু’জন দু’পাশের খোলা জানালা দিয়ে পেছনে তাকাল। দেখতে পেল প্রেসিডেন্ট ও তার বেগমকে।

আহমদ মুসা ও জোসেফাইন দু’জনেই হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

আহমদ মুসা দেখতে পেল, প্রেসিডেন্টের গাড়ি বারান্দায় তখন দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি। আহমদ মুসা তাদের উদ্দেশ্যেও হাত নাড়ল। তারাও হাত নাড়ল।

আহমদ মুসাদের গাড়ি প্রেসিডেন্ট হাউজের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসাদের সামনে ছিল জেনারেল মোস্তফা ও দীর্ঘ অসুখ থেকে সদ্য ফিরে আসা জেনারেল তারিকদের দু'টি গাড়ি। আর আহমদ মুসাদের পেছনের একটা মাইক্রোতে গোয়েন্দা পুলিশের একটা দল।

আহমদ মুসা হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে এগারোটা বাজে। শিডিউলের চেয়ে একটু বেশি সময় গেছে প্রেসিডেন্ট হাউজের অনুষ্ঠানে।

প্রেসিডেন্ট তার বাড়িতে জোসেফাইন ও আহমদ মুসার জন্যে প্রায় ঘরোয়া একটা সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল। এর আগের দিন আহমদ মুসারা আংকারা এসেছিল প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে। তাদের সাথে এসেছিল গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল মোস্তফা এবং জেনারেল তাহির তারিক। প্রেসিডেন্টের ফ্যামিলি পরিবেশে ঘরোয়া এ অনুষ্ঠানে হাজির ছিল প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, গোয়েন্দা প্রধান ও পুলিশ প্রধান। অনুষ্ঠানে খোদ প্রেসিডেন্ট আহমদ মুসা ও বেগম আহমদ মুসাকে তার নিজের পক্ষ থেকে ও তুরস্কের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। আবেগজড়িত কণ্ঠে প্রেসিডেন্ট বলেছিল, কিন্তু কোন কৃতজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়। আহমদ মুসা উত্তরে বলেছিল, 'ভাইয়ের জন্যে যে কাজ তা নিজেরই কাজ। নিজের কাজের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা প্রত্যাশা বিব্রতকর। তুরস্ক আমার কাছে একটা স্বপ্নের দেশ। আজ বিদায় বেলায় মনে হচ্ছে, স্বপ্নের এই দেশ আমাকে অনেক দিয়েছে। তাই নিজেকে মনে হচ্ছে আরও সুস্থ, আরও সমৃদ্ধ।'

আহমদ মুসাকেও আবেগ স্পর্শ করেছিল। তার কণ্ঠও ভারী হয়ে উঠেছিল।

অনুষ্ঠান শেষে মাদাম প্রেসিডেন্ট একটা রূপোর কেসকেটে হীরার নেকলেস উপহার দিয়ে 'মাই ডটার' বলে জড়িয়ে ধরেছিল জোসেফাইনকে। আর প্রেসিডেন্ট তার ও তার দেশের পক্ষ থেকে আহমদ মুসার হাতে তুলে দিয়েছিল আহমদ মুসা, জোসেফাইন ও আহমদ আব্দুল্লাহর জন্যে তুরস্কের নাগরিকত্বের তিনটি সনদ ও তিনটি পাসপোর্ট। আহমদ মুসা ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করেছিল তুর্কি প্রেসিডেন্টের এ রাষ্ট্রীয় দান।

বিদায়ের সময়টা হয়েছিল খুবই আবেগঘন।

আবেগের সে উত্তাপ এখনও অনুভব করছে আহমদ মুসা।

গাড়ি ছুটে চলছিল আংকারা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে।

ড. আজদা আয়েশার হাত স্টিয়ারিং হুইলে। দৃষ্টি সামনে।

চলছিল গাড়ি।

আনমনা হয়ে পড়েছিল ড. আজদা আয়েশা। ভাবছিল সে নিজেকে নিয়ে নয় শুধু। তার মাথায় আসছে না তার প্রিয় মাতৃভূমিতে এসব কি হচ্ছে! তার নিজের পরিবারের ওপর যেমন, তেমনি দেশের এই অঞ্চলের ওপর যেন একটা কালোছায়া নেমে আসছে সবকিছু গ্রাস করার জন্যে।

ড. আজদা আয়েশার গাড়ির নাক বরাবর এগিয়ে আসছিল একটা মাইক্রো রং সাইড নিয়ে।

সম্বিত ফিরে পেয়েছিল ড. আজদা আয়েশা। শেষ মুহূর্তে হার্ড ব্রেক কষেছিল সে।

মাইক্রোর সাথে সংঘর্ষ এড়াতে পারল ড. আজদা আয়েশা। সে বিস্মিত হলো, মাইক্রোটা রং সাইড নিয়ে এভাবে তার সামনে এল কেন?

তার মনের এই প্রশ্নের রেশটা না কাটতেই সে দেখতে পেল, মাইক্রো থেকে চারজন লোক লাফ দিয়ে নেমে দু'পাশ থেকে এসে তার গাড়ির দু'পাশে দাঁড়াল।

ড. আজদা আয়েশা কিছু ভাববার আগেই দু'দিক থেকে ওরা গাড়ির দু'পাশের দরজা টান দিয়ে খুলে ফেলল।

চোখের পলকে দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়ল ড. আজদা আয়েশার ওপর। টেনে বের করল তারা ড. আজদাকে। তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল মাইক্রোর দিকে। একজন চিৎকার করে বলল, 'তোর জন্যে আমাদের এক ছেলেকে মরতে হয়েছে। ধরা পড়া কাউকে যেমন আমরা রাখি না, তেমনি যার কাছে ধরা পড়ে তাকেও আমরা দুনিয়াতে রাখি না। আর তোকে আমরা গোরস্তানে নিয়ে মারব।'

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমেই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল ড. আজদা আয়েশা। বুঝতে পারছিল না কারা এরা, কেন তার ওপর এই আক্রমণ। কিন্তু ওদের কথা শুনে বুঝতে পারল সব ব্যাপার।

ড. আজদা আয়েশাকে যখন ওরা মাইক্রোতে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন ‘বাঁচাও’ ‘বাঁচাও’ বলে চিৎকার করছিল সে।

ঠিক এই সময়েই একটি জীপ এসে মাইক্রোর সামনে থামল।

পুলিশের জীপ।

জীপে একজন মাত্র পুলিশ। সেই ড্রাইভ করছিল গাড়ি।

জায়গাটা রাস্তার একটা মোড়। গোটা মোড় আলোকিত।

জীপটা দাঁড়াতেই পুলিশটি লাফ দিয়ে নামে গাড়ি থেকে। চিৎকার করে বলল, ‘কে তোমরা? ছেড়ে দাও মেয়েটাকে। হাত তুলে দাঁড়াও।’

ঠিক এ সময় আরেকটি কার এসে দাঁড়াল জীপের পাশে। কার থেকে একজন যুবক এসে দাঁড়াল পুলিশের পাশে।

পুলিশের নির্দেশ শুনে কিডন্যাপকারীরা একসাথেই তাকাল পুলিশের দিকে।

পুলিশটিকে মনে হলো ওদের চেনা। ওদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওদের একজন চিৎকার করে বলে উঠল, ‘ইন্সপেক্টর দারাগ! চিন্তা নেই। আমরা হোলি আরারাতের লোক। হোলি আরারাত জিন্দাবাদ।’

কিডন্যাপারদের কথা শোনার সাথে সাথে পুলিশের চেহারা পাল্টে গেল। চোখ দু’টি তার লোভের আলোতে চক্ চক্ করে উঠল।

‘মেয়েটা কে?’ চিৎকার করে বলে উঠল পুলিশ।

‘আতা সালাহ উদ্দিনের বোন। আরেক ড্রাগ ট্রেডার। অশান্তি সৃষ্টি করছিল। আমাদের একজন লোকও আমার হারিয়েছি। অবশেষে আজ হাতে পেয়েছি ইন্সপেক্টর।’ বলল কিডন্যাপারদের একজন।

পুলিশের পাশে এসে দাঁড়ানো যুবকটি কিডন্যাপারদের কথা শুনে চমকে উঠল। ভালো করে তাকাল সে মেয়েটির দিকে। হ্যাঁ, ওরা ঠিক ঠিক বলেছে। আতা

সালাহ উদ্দিনের বোন ড. আজদা আয়েশাই তো সে! ভীষণ চমকে উঠল যুবকটি। আজদাকে শয়তানরা কিডন্যাপ করছে!

যুবকটির ভাবনা হোঁচট খেল পুলিশের উচ্চকণ্ঠে। পুলিশ চিৎকার করে বলছে, 'ঠিক আছে, নিয়ে যাও ওকে। পুলিশের সামনে পড়ো না। অযথা ঝামেলা হয় আমাদের। যাও তাড়াতাড়ি।'

যুবকটি ভীষণ অবাক হলো পুলিশের কথায়। কানকে যেন তার বিশ্বাস হলো না। তাকাল পুলিশের দিকে। পুলিশটি ইন্সপেক্টর লেভেলের একজন অফিসার। অবশ্যই তুর্কি, কিন্তু চেহারায় আর্মেনীয় ছাপ স্পষ্ট। তার মানে, তার মা আর্মেনীয় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

যুবকটি পুলিশের কথার প্রতিবাদ করে বলল, 'মি. অফিসার, আপনি এ কি বলছেন! ক্রিমিনালদের হাত থেকে মেয়েটিকে রক্ষা করা, ক্রিমিনালদের পাকড়াও করা আপনার দায়িত্ব।'

'তুমি যেখানে যাচ্ছিলে যাও। পুলিশের কাজে নাক গলাতে এসো না। কে ক্রিমিনাল, সেটা পুলিশই ভালো জানে।'

বলেই পুলিশ কিডন্যাপারদের লক্ষ্য করে চিৎকার করে একটা গালি দিয়ে উঠল, 'শয়তানের বাচ্চারা, এখনও যেতে পারলি না?'

কিডন্যাপাররা টেনে-হিঁচড়ে ড. আজদাকে তাদের মাইক্রোতে তোলার কাজ শুরু করল। আর পুলিশ অফিসারটি তার জীপে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গেল।

যুবকটি বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ চোখ দু'টি তার জ্বলে উঠল। সে আকস্মিকভাবে তার ডান হাত বাড়িয়ে পুলিশ অফিসারের কোমরের রিভলভার বক্স থেকে প্রবল একটা হ্যাঁচকা টানে রিভলভার বের করে নিল। রিভলভার তুলল সে ড. আজদাকে পাঁজাকোলা করে ধরে মাইক্রোর দিকে এগোনোরত কিডন্যাপারদের দিকে। জ্বলছিল তখন যুবকটির দু'চোখ। পরপর সে চারটি গুলি করল।

অব্যর্থ লক্ষ্য যুবকটির।

চার কিডন্যাপারের সবাই কেউ মাথায়, কেউ পিঠে, কেউ বুকে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল।

পুলিশ অফিসারটি ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমটায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তারপরই সে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল যুবকটির ওপর।

যুবকটি কয়েক ধাপ এগিয়ে রিভলভার তাক করল পুলিশ অফিসারের দিকে। বলল, 'ওদের মত তুমিও ক্রিমিনাল। বাড়াবাড়ি করলে তোমাকেও গুলি করব।'

কিডন্যাপারদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ড. আজদা আয়েশা কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এসে যুবকটির গা ঘেঁষে দাঁড়াল। যুবকটি তার বাম হাত ড. আজদার পিঠে রেখে বলল, 'ভয় পেয়ো না ড. আজদা। ক্রিমিনালদের ভয় কিসের।'

'কিন্তু আমার জন্যে এই খুনোখুনির মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন কেন ড. মোহাম্মদ বারজেনজো? সময় খারাপ, পুলিশকে তো আপনি জানেন।' বলল আজদা আয়েশা।

ওদিকে পুলিশ অফিসার থমকে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে বলল, 'তুমি পুলিশ অফিসারের রিভলভার ছিনতাই করে চারজন লোককে খুন করেছ, তোমার বাঁচার আশা নেই। রিভলভার নামাও। দাও আমাকে রিভলভার।'

'না, রিভলভার তোমাকে দেব না। আমার বাঁচার আশা নেই বলেছ, তোমার মত ক্রিমিনালকে আমি বাঁচতে দেব না ভালো লোকদের বাঁচার স্বার্থেই।'

বলে যুবকটি রিভলভারের নল তাক করল পুলিশ অফিসারের দিকে।

পুলিশ অফিসার যখন কিডন্যাপারদের সাথে কথা বলছিল, সেই সময় আরেকটি গাড়ি এসে যুবকটির গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়েছিল। দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে এসেছিল একজন মানুষ। কমপ্লিট ইউরোপীয়ান পোশাক। মাথায় হ্যাট। কপাল পর্যন্ত নামানো।

যুবকটির পেছনে দাঁড়িয়ে সব কিছুই সে দেখছিল, শুনছিল।

‘তোমার মত ক্রিমিনালকে আমি বাঁচতে দেব না’ বলে যুবকটি যখন রিভলভার তুলল পুলিশকে লক্ষ্য করে, তখন পেছনের আগন্তুক লোকটি যুবকটির পাশে এসে দাঁড়াল। বলল যুবকটিকে লক্ষ্য করে, ‘রিভলভারটি নামান।’

যুবকটি তাকাল আগন্তুক লোকটির দিকে। দেখল, ঋজু দেহের এক মানুষ। যতটুকু দেখা যাচ্ছে লোকটির চোখ-মুখ ভাবলেশহীন, কিন্তু অসম্ভব দৃঢ় এক ব্যক্তিত্বের ছাপ তার মুখে। তার দু’শব্দের কথাটি শান্ত, কিন্তু তার মধ্যে একটা নির্দেশ আছে, তা যেন অলংঘনীয়। বিস্মিত হলো যুবকটি। রিভলভারের নল নামিয়ে নিল সে বিনা বাক্যব্যয়ে।

সংগে সংগেই পুলিশ অফিসারটি বলে উঠল, ‘ধন্যবাদ আগন্তুক মহোদয়, এই যুবকটি আমার রিভলভার এক সুযোগে তুলে নিয়ে ঐ চারজন লোককে খুন করেছে। খুনির শাস্তি হতেই হবে।’

বলেই পুলিশ অফিসারটি যুবকটিকে ধমক দিয়ে বলল, ‘রিভলভার দিয়ে দাও, আর তুমি আন্ডার অ্যারেস্ট। পালানোর চেষ্টা করো না।’

ড. আজদা আয়েশার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এই ভয়ই সে করছিল, খুনের দায় এবার মোহাম্মদ বারজেনজোর ঘাড়ে চাপবে। উদ্বেগ-আতংকে ড. মোহাম্মদ বারজেনজোর কাঁধ আঁকড়ে ধরল ড. আজদা।

‘ধীরে অফিসার, ধীরে। আমি পেছনে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। আপনি কিডন্যাপারদের পালিয়ে যেতে বলছিলেন কিডন্যাপডকৃত মেয়েটিসহ। আসল ক্রিমিনাল তো আপনি। ড. মোহাম্মদ তো কিডন্যাপারদের হত্যা করে মেয়েটিকে বাঁচিয়েছে।’ বলল আগন্তুক লোকটি।

‘কে বলল, ওরা কিডন্যাপার? খুনকে ধামাচাপা দেয়ার জন্যে মেয়েটি বলবে, ওরা তাকে কিডন্যাপ করছিল, কিন্তু আইনে টিকবে না এই কথা। আমার চোখের সামনে ঘটনা ঘটেছে।’ বলে হো হো করে হেসে উঠল পুলিশ অফিসারটি।

আগন্তুক লোকটির মুখ-চোখ কঠোর হয়ে উঠেছে। বলল, ‘তাহলে মি. অফিসার, আমিও একটা কাহিনী বানাই।’

বলে আগন্তুক লোকটি পকেট থেকে রিভলভার বের করল। তাক করল পুলিশ অফিসারকে। বলল, ‘আমি আপনাকে হত্যা করব। হত্যার পর এই

রিভলভারটি মৃত ঐ চারজনের হাতে ধরিয়ে দেব। তারপর ড. মোহাম্মদ বারজেনজো থানায় গিয়ে খবর দেবে, 'চারজন কিডন্যাপকারী ড. আজদাকে কিডন্যাপ করছিল। পুলিশ অফিসারটি ওদের বাঁধা দিলে ওরা পুলিশ অফিসারকে গুলি করে মারে। আমি পুলিশ অফিসারের পাশে ছিলাম সে সময়। আমি পুলিশ অফিসারের রিভলভার নিয়ে ওদের গুলি করে মারি। কেমন হবে এই কাহিনীটি, অফিসার?'

পুলিশ অফিসার আগন্তুক লোকটির কণ্ঠস্বর এবং তার কপাল বরাবর রিভলভারের নল উদ্ধত দেখে আতংকিত হয়ে উঠেছে। বলল, 'পুলিশ অফিসারকে গুলি করতে পার না। পুলিশ মেরে পার পাবে না।'

আগন্তুক লোকটি তার রিভলভার পুলিশ অফিসারকে তাক করে রেখে ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল, 'আমি নয়, প্রমাণ হবে কিডন্যাপকারীরা আপনাকে মেরেছে। তবে আপনার বাঁচার আরেকটা পথ আছে।'

'কি সেটা?' বলল পুলিশ অফিসার।

'ঐ চারজন কিডন্যাপারকে হত্যার দায় আপনাকে নিতে হবে।' বলল আগন্তুকটি। সেই ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর তার।

'কিভাবে?' জিজ্ঞাসা পুলিশ অফিসারের।

আগন্তুক লোকটি তার রিভলভার পুলিশ অফিসারের দিকে ধরে রেখেই পাশে দাঁড়ানো যুবকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ড. মোহাম্মদ বারজেনজো, আপনি আপনার হাতের পুলিশ অফিসারের রিভলভারটি রুমাল দিয়ে ধরে রুমাল দিয়ে ভালো করে মুছে ফেলুন এবং রুমাল দিয়ে নলটি ধরে রিভলভারটি পুলিশ অফিসারকে দিয়ে দিন।'

'কিন্তু রিভলভারে আরও দু'টি গুলি আছে মনে হয়।' বলল যুবক ড. বারজেনজো।

'ধন্যবাদ হুঁশিয়ার থাকার জন্যে। কিন্তু ভয় নেই। আমি দেখবো।' বলল আগন্তুক লোকটি।

ড. মোহাম্মদ বরজেনজো আগন্তুকের নির্দেশ মত রিভলভারটি রুমাল দিয়ে তার হাতের ছাপ ভালো করে মুছে পুলিশ অফিসারের হাতে দিয়ে দিল।

পুলিশ অফিসার রিভলভার হাতে পেয়েই চোখের পলকে রিভলভারের নল ঘুরিয়ে নিল আগন্তুকের লক্ষ্যে। কিন্তু তার রিভলভারের নল থেকে গুলি বেরুনোর আগেই আগন্তুকের হাতের রিভলভার গর্জন করে উঠল। গুলি গিয়ে পুলিশ অফিসারের ডান কাঁধের বাহুসন্ধিস্থলকে বিদ্ধ করল।

রিভলভার পড়ে গেল পুলিশ অফিসারের হাত থেকে।

পুলিশ অফিসারটি বাম হাত দিয়ে কাঁধ চেপে ধরে আর্তনাদ করে বসে পড়ল।

আগন্তুক লোকটি বাম হাত দিয়ে রিভলভার তুলে নিয়ে চারজন কিডন্যাপারের লাশের দিকে ফাঁকা গুলি করে অবশিষ্ট গুলিটা শেষ করল।

পুলিশ অফিসার চিৎকার করে বলল, আগন্তুককে লক্ষ্য করে, 'ক্ষমার অযোগ্য তোমার এই অপরাধের চড়া মূল্য তোমাকে দিতে হবে। তুমি একজন পুলিশ অফিসারকে গুলি করেছ।'

আগন্তুক লোকটি একটু হাসল। বলল শান্ত কণ্ঠে, 'কিছুই করতে পারবেন না আমার। একটা নতুন কাহিনী আবার তৈরি হলো। আপনি কিডন্যাপারদের যখন চ্যালেঞ্জ করেন, তখন আমরা আপনার সাথে ছিলাম। কিডন্যাপাররা আপনাকে গুলি করে পালাতে চেষ্টা করে। আমি আপনার হাত থেকে রিভলভার নিয়ে কিডন্যাপারদের গুলি করে মারি।'

পুলিশ অফিসারটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'আমি বলব, এ কাহিনী ঠিক নয়।'

'প্রমাণ বলবে, এই কাহিনীই ঠিক। যে রিভলভার দিয়ে আমি আপনাকে গুলি করেছি, এ রিভলভার আমি এখন কিডন্যাপারদের হাতে দিয়ে দেব। এতে থাকবে ওদের একজনের আঙুলের ছাপ।'

একটু থামল আগন্তুক। তারপর আবার বলল সেই ঠাণ্ডা, শান্ত কণ্ঠে পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে, 'অফিসার, আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমার প্রতি এই কারণে যে, আমি আপনার বুকে কিংবা মাথায় গুলি করিনি।'

আবার থামল আগন্তুক। সংগে সংগেই আবার বলে উঠল, 'হত্যা একটা জঘন্য কাজ, আত্মরক্ষার ক্ষেত্র ছাড়া। কিন্তু আত্মরক্ষা করতে গিয়েও কষ্ট করে টার্গেট চেইঞ্জ করে আপনার বাহুসন্ধিতে গুলি করে আপনাকে বাঁচিয়েছি কেন জানেন? ঐ কিডন্যাপারদের পরিচয় আপনি জানেন, সে পরিচয় আপনার কাছ থেকে জানার জন্যে।'

পুলিশ অফিসারের চোখ-মুখ থেকে ক্রোধের ভাব উবে গেল। কিছুটা শান্ত হলো সে। সেও মনে মনে স্বীকার করলো, তার সহজ টার্গেট বুক, মাথায় গুলি না করে বাহু সন্ধির মত ঝুঁকিপূর্ণ প্রান্তিক টার্গেটে গুলি করেছে নিশ্চয় আমাকে বাঁচানোর জন্যেই। কিন্তু সেই সাথে বিস্ময় এসে তাকে ঘিরে ধরল, কিডন্যাপারদের পরিচয় জানতে চায় কেন সে! আর লোকটি সাধারণ নয়, দারুণ তীক্ষ্ণ ধী-শক্তিসম্পন্ন ও ক্ষীপ্র!

'কে আপনি? আমি ওদের পরিচয় জানি কি করে বুঝলেন? আর ওদের পরিচয় দিয়েই বা আপনি কি করবেন?' গড়গড় করে প্রশ্নগুলো করে গেল পুলিশ অফিসারটি।

'ওরা আপনাকে নাম ধরে সম্বোধন করেছে, আর আপনিও ওদের চিনতে পেরেই ওদের আপনি সুযোগ দিয়েছিলেন মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যেতে।' বলল আগন্তুক লোকটি।

পুলিশ অফিসার সংগে সংগেই কোন উত্তর দিল না। তার চোখের স্থির দৃষ্টি আগন্তুক লোকটির দিকে। চোখে তার বিস্ময়, আগের সেই ক্রোধ এখন নেই।

কথা শেষ করেই আগন্তুক লোকটি ড. বারজেনজোকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি আমার রিভলভারটা কিডন্যাপারদের হাতে দিয়ে আসি।'

দু'হাতে দু'রিভলভার নিয়ে এগোলো আহমদ মুসা কিডন্যাপারদের লাশগুলোর দিকে।

ওখানে পৌঁছে আগন্তুক লোকটি নিজের রিভলভারটি ভালো করে রুমাল দিয়ে মুছে একজন কিডন্যাপারের হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর ডান হাতে পুলিশ অফিসারের রিভলভার রেখে কিডন্যাপারদের লাশ উল্টে-পাল্টে প্রত্যেকের বাহু

দেখে নিল এবং প্রত্যেকের মানিব্যাগসহ সব পকেট হাতড়েও দেখল কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কোন কাগজপত্র পেল না। এমনকি কোন আইডি কার্ডও নয়।

ফিরে এল আগন্তুক লোকটি ড. বারজেনজোদের কাছে।

পুলিশ অফিসার তার বাম কাঁধ চেপে ধরে তখন বসেই ছিল। সে দেখছিল আগন্তুকের কাজকর্ম। আগন্তুক ফিরে আসতেই সে বলল, 'আপনি প্রত্যেকের বাহুতে কি দেখছিলেন, আর ওদের পকেট-মানিব্যাগেই বা কি খুঁজছিলেন?'

'ওদের বাহুতে একটা চিহ্ন খুঁজছিলাম এবং মানিব্যাগে ও পকেটে ওদের পরিচয়সূচক কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় কিনা দেখছিলাম।' আগন্তুক বলল।

'কেন?' বলল পুলিশ অফিসার।

'না, এমনি। পরিচয় সম্পর্কে কৌতুহল আছে। আপনার কাছ থেকেও তো জানতে চেয়েছি।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলে উঠল আগন্তুক, 'আপনার পুলিশ কি আসছে লাশ নিতে? আমাদের মানে মি. বারজেনজো ও ড. আজদার কেইস তো রেকর্ড করাতে হবে।'

'বলেছি, ওরা আসছে। আসলেই আমরা থানায় যাব।'

বলে ডান হাতটা বাড়াতে গিয়ে পুলিশ অফিসারটি বেদনায় কঁকিয়ে উঠল।

তখনও রক্ত ঝরছিল আহত স্থান থেকে।

'ও! স্যরি। আপনার ওদিকে নজরই দেয়া হয়নি।'

বলে আগন্তুক ছুটল তার গাড়ির দিকে। এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল একটা অটো-ব্যান্ডেজ নিয়ে। এগোলো সে পুলিশ অফিসারের দিকে। বলল, 'অফিসার, ফাস্ট এইড হিসেবে এই ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি। আপনি আরাম পাবেন।'

'এতো মিলিটারিদের ফিল্ড ব্যান্ডেজ! একদম লেটেস্ট। খুব দামি। আপনি এ ব্যান্ডেজ পেলেন কোথায়?' বলল পুলিশ অফিসার।

‘হ্যাঁ, ব্যান্ডেজটা খুব কাজের। একদিকে রক্ত শুষে নিয়ে আহত জায়গাটা পরিষ্কার করে, অন্যদিকে ব্যান্ডেজটা ক্রেপ শক্তি চাপ সৃষ্টি করে রক্তপাতও বন্ধ করে দিতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ব্যান্ডেজটা একটা ‘মেডিক্যাল কিট’। আহত জায়গার চিকিৎসাও শুরু করে দেয় ব্যান্ডেজটা।’

আগন্তুক কথা বলার সাথে সাথে ব্যান্ডেজের কাজও করছিল।

পুলিশ অফিসারটি বিস্ময়-দৃষ্টিতে দেখছিল আগন্তুককে। এমন অদ্ভুত লোক সে জীবনে দেখেনি। শত্রুতা করেছে, গুলি করে আহতও করেছে বটে। কিন্তু এ বিষয়টা তার কাছে আর বড় বিষয় নয়। তাকে যে সুযোগ পেয়েও হত্যা করেনি, এটাকেই সে বড় করে দেখছে। তারপর এ শুশ্রূষাও প্রমাণ করে, সে হিংসুটে কোন ক্রিমিনাল ধরনের লোক নয়।

অন্যদিকে ড. আজদা ও ড. মোহাম্মদ বারজেনজোর চোখে-মুখে বিস্ময় আর কৌতুহলের বন্যা। আগন্তুককে তাদের মনে হচ্ছে আল্লাহর পাঠানো ফেরেশতা। বুদ্ধি, ক্ষীপ্রতা, সাহস ও মানবতা সব দিক দিয়েই তাকে ফেরেশতার মত কোন অতি উঁচুস্তরের কেউ মনে হচ্ছে। গুলি করতেও যেমন সে দ্বিধা করেনি, তেমনি আবার সেই আহতের শুশ্রূষাতেও তার কোন জড়তা নেই!

আগন্তুকের কথা শেষ হতেই পুলিশ অফিসার বলল, ‘কিন্তু আপনি এ ব্যান্ডেজ পেলেন কোথায়? যুদ্ধক্ষেত্রের মত পরিবেশে সেনাবাহিনী এ ব্যান্ডেজ ব্যবহার করে। সাধারণভাবে এটা ব্যবহারও হয় না, কিনতেও পাওয়া যায় না।’

পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের কোন সরাসরি জবাব না দিয়ে বলল, ‘টাকা হলে বাঘের চোখ মেলে।’

ঠিক এ সময় দু’টি পিকআপে পুলিশ এসে গেল।

একটা পিকআপের সামনের কেবিন থেকে লাফ দিয়ে নামল দু’জন পুলিশ অফিসার।

ছুটে এল দু’জন পুলিশ অফিসার। তাদের বসের ব্যান্ডেজ বাঁধা বাহুসন্ধির দিকে একবার ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে বলল, ‘আপনি ঠিক আছেন তো স্যার? আর কোন অসুবিধা নেই তো?’

‘আমি ঠিক আছি। আমাকে নিয়ে তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। তোমরা সুরতহাল করে লাশগুলো ও ওদের মাইক্রোটা নিয়ে চলে এস। আমি যাচ্ছি ওদের নিয়ে। ঐ ভদ্রমহিলাকে ঐ ক্রিমিনালরা কিডন্যাপ করা থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে। আমি ওদের কেইসটা রেকর্ড করাই। তোমরা এস।’ বলল পুলিশ অফিসার।

‘জ্বি স্যার, আপনি ওদের নিয়ে যান স্যার। আমরা আমাদের হাসপাতালে টেলিফোন করে রেখেছি স্যার। আপনার রেস্টও দরকার স্যার।’

মুখস্থ কথার মত গড়গড় করে কথাগুলো বলে গেল একজন পুলিশ অফিসার।

‘ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তোমরা এস।’ বলল পুলিশ অফিসার রশিদ দারাগ।

‘স্যার, আপনি ওদের থানায় কেইস লেখানো রেখে চলে যাবেন হাসপাতালে।’ বলল সেই পুলিশ অফিসার।

‘হ্যাঁ, আমি ওদের ডিউটি অফিসারের হাতে দিয়েই চলে যাব।’ পুলিশ ইন্সপেক্টর রশিদ দারাগ বলল।

বলেই ইন্সপেক্টর দারাগ গিয়ে গাড়িতে উঠল। একজন পুলিশ উঠল তার গাড়ির ড্রাইভিং সিটে।

আগন্তুক লোকটি, ড. শেখ মোহাম্মদ বারজেনজো এবং ড. আজদা আয়েশা তিনজনেই গাড়ি নিয়ে ফলো করল ইন্সপেক্টর দারাগের গাড়িকে।

থানায় পৌঁছে ইন্সপেক্টর রশিদ দারাগ প্রথমে ডিউটি অফিসারকে দিয়ে নিজের একটি স্টেটমেন্ট রেকর্ড করাল। তাতে সে আগন্তুক লোকটি সর্বশেষে যে কাহিনী দাঁড় করিয়েছিল, সেটাই হুবহু বলে গেল। তারপর ড. আজদাদের বক্তব্য রেকর্ড করতে বলে সে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ফিরে তাকাল সে। বলল আগন্তুক লোকটিকে লক্ষ্য করে, ‘ইয়ংম্যান, আপনার নাম জানা হয়নি।’

‘আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।’ বলল আগন্তুক লোকটি।

‘আপনার পরিচয় জিজ্ঞেস করবো না। কারণ নামের মতই একটা কিছু শুনতে হবে। শুধু সাবধান করে দিচ্ছি, সাপের লেজে কিন্তু পা দিয়েছেন, ছোবল

খেতে হবে। ড. আজদারা ছোবল খাচ্ছেন। আজকের ঘটনার পর ওদের কি হবে, তা বলার প্রয়োজন নেই। আবার দেখা হবে।'

আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে কথা কয়টি বলে পুলিশ ইন্সপেক্টর রশিদ দারাগ চলে যাচ্ছিল। আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহ তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'শুনুন অফিসার, আপনার কথায় বোঝা যাচ্ছে, ড. আজদারা আরও বড় বিপদে পড়ছেন। এটা বলা কিন্তু আপনাদের দায়িত্ব নয়, দায়িত্ব নাগরিকদের রক্ষা করা।'

পুলিশ অফিসারটি হাসল। বলল, 'পুলিশরা খুব দুর্বল জীব। কিছু দায়িত্ব তারা পালন করে। সব দায়িত্ব তাদের নয়, সব দায়িত্ব পালনের ক্ষমতাও তাদের নেই।'

'সব দায়িত্ব পালনের কথা বলছি না অফিসার। ড. আজদাদের রক্ষার কথা বলছি।' বলল আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।

'এ ক্ষমতা পুলিশের নেই দেখতে পাচ্ছি।' পুলিশ অফিসার দারাগ বলল।

'কেন?' জিজ্ঞাসা আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহর।

'এই 'কেন'-এর জবাব আমিও সব জানি না।'

বলেই পুলিশ অফিসার তার গাড়ির দিকে এগোলো।

আগন্তুক কণ্ঠ একটু চড়িয়ে বলল, 'এই 'কেন' নিয়ে আপনার সাথে আরও কথা বলতে চাই অফিসার।'

'আপনার পরিচয় সম্বন্ধেও আমার জানার আছে।'

বলতে বলতে গাড়িতে উঠে বসল পুলিশ অফিসার দারাগ।

পুলিশ অফিসার দারাগ চলে যেতেই থানার ডিউটি অফিসার ড. আজদাদের তাড়া দিল, 'আপনারা আসুন, কাজটা সেরে ফেলি।'

ড. আজদা, ড. মোহাম্মদ বারজেনজো ও আগন্তুক আবু আহমদ আবদুল্লাহ সবারই বক্তব্য রেকর্ড করল ডিউটি অফিসার।

ডিউটি অফিসার ড. আজদা ও ড. মোহাম্মদ বারজেনজোর পরিচয় পেয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলছিল, 'স্যার, আপনাদের দু'পরিবার আমাদের কুর্দি জাতির প্রাণ।'

ড. আজদা ও ড. মোহাম্মদ বারজেনজো চাপ না দেয়া পর্যন্ত চেয়ারে বসেনি।

ড. বারজেনজো বলেছিল, ‘এ পরিবারের কোন সম্মান কি এখন আছে!’

ডিউটি অফিসার বলেছিল, ‘যারা মানুষ তাদের কাছে আছে, তবে কিছু মতলবি মানুষের কাছে নেই। তারা অন্য কিছু চায়, অন্য কিছু করে।’

আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করেছিল, ‘তোমাদের অফিসার রশিদ দারাগ কি মতলবিদের দলে?’

ডিউটি অফিসার আগন্তুকের দিকে একবার তাকিয়ে একটু ভেবে বলেছিল, ‘তিনি চলমান স্রোতের বাইরে এক পা’ও রাখেন না। তবে তিনি দেশকে ভালোবাসেন। কিন্তু ঝামেলামুক্ত থাকতে চান সব সময়।’

ডিউটি অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়েছিল আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।

জবানবন্দী রেকর্ডের পর তিনজনই বেরিয়ে এল থানা থেকে।

থানা থেকে বের হবার জন্যে পা বাড়িয়ে স্বস্তিতে ভরে গেল ড. আজদার মন। খুনোখুনি ও পুলিশের আচরণের মুখে একসময় তার মনে হয়েছিল, তার মুক্ত জীবনের এখানেই শেষ। তার দুর্ভাগ্যের সাথে ড. বারজেনজো জড়িয়ে পড়ায় আরও মুষড়ে পড়েছিল সে। ড. বারজেনজো ও তার মধ্যে এখনও বড় দূরত্বের দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে, এরপরও বারজেনজো তার জন্যে স্বস্তির একটা আশ্রয়। সেও তার সাথে সাথে খুনোখুনির মত বিপদে জড়িয়ে পড়ায় বুক ভেঙে গিয়েছিল তার। এ সময়ই আল্লাহর মূর্তিমান সাহায্যের মত এলেন আগন্তুকটি। সিচুয়েশন নিজের আয়ত্তে নেয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা, ঠাণ্ডা-শান্ত কথাগুলো তার, কিন্তু তার মধ্যে যেন লুকিয়ে আছে অমোঘ শক্তি। বুদ্ধি, কৌশল, দূরদর্শিতা কোন ক্ষেত্রে তার ত্রুটি নেই, এরও প্রমাণ দিয়েছেন তিনি। তার মানবিকতা ও দরদের দিকটাও প্রশংসনীয়। পুলিশ অফিসার নীরব হয়েছে তার ব্যবহারের কারণেই। হঠাৎ তার মনে হলো, আগন্তুকের গাড়িতে সর্বাধুনিক ধরনের ঐ ব্যান্ডেজ ছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর জানা তার কাছে পুলিশ অফিসারের চেয়েও অধিক জরুরি মনে হয়েছে। কিন্তু এর উত্তর সে পায়নি। আলো-অন্ধকারে কপাল পর্যন্ত নামানো ফেল্ট

হ্যাটের কারণে আগন্তুক লোকটিকে তখন ভালো করে দেখা যায়নি। তখন তাকে চালাক ধরনের রাশভারী ও দুর্বোধ্য মুখাবয়বের লোক মনে হয়েছিল। কিন্তু থানা-কক্ষের উজ্জ্বল আলোতে ফেল্ট হ্যাট খোলা আগন্তুককে একদমই ভিন্ন মনে হয়েছে। একহারা ঋজু গড়নের অনিন্দ্যসুন্দর এক যুবক সে। তার চেয়ে সুন্দর তার মুখের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা। এই মানুষ কিছুক্ষণ আগে অমন কঠোর ভূমিকা পালন করেছে, গুলি করেছে পুলিশ অফিসারকে, ভাবতেই কষ্ট লাগে।

থানা থেকে বেরিয়ে তারা তিনজনই এসে তাদের গাড়ির কাছে দাঁড়াল।

দাঁড়াতেই ভাবনার ইতি ঘটে গেল ড. আজদা আয়েশার। ড. আজদা আয়েশা পাশেই কিন্তু একটু দূরত্বে দাঁড়ানো আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলল, ‘স্যার, যদিও কোন ধন্যবাদ দিয়েই ঋণ শোধ হবে না, দায় শোধ হবে না, তবু ধন্যবাদ ছাড়া তো আর কিছু নেই দেবার। তাই আপনাকে ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আল্লাহর সাহায্যের মত এসেছেন।’

ড. আজদার কথা শেষ হতেই ড. বারজেনজো বলে উঠল আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে, ‘আরও বেশি ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে। আপনি আমাকে চার খুনের দায় থেকে মানে সাক্ষাৎ মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচিয়েছেন অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা ও নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। এ ঋণের কোন পরিশোধ নেই মি. আবু আব্দুল্লাহ।’

আগন্তুক আবু আব্দুল্লাহ হাসল। বলল, ‘ড. আজদা যা বলেছেন, আমি যদি আল্লাহর সাহায্য হই, তাহলে তো আমার কোন কৃতিত্ব থাকে না। সবটা কৃতিত্বই আল্লাহর। আপনার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। যাক, এসব কথা আর নয়। এখন তো গৃহে ফেরার পালা, রাত অনেক হয়েছে। ড. আজদাকে কি ড. বারজেনজো পৌঁছে দেবেন?’

ড. বারজেনজো কিছু বলার আগেই ড. আজদা বলে উঠল, আগন্তুক আবু আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে, ‘স্যার, আমার অনুমান সঠিক হলে আপনি বিদেশী। আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন, কোথায় যাবেন এত রাতে সেটা আমাদের জানা দরকার।’

ড. আজদার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ড. বারজেনজো বলল, 'ড. আজদা ঠিক বলেছেন। এটাই না আমাদের প্রথম জানা দরকার।'

'আপনাদের অনুমান সত্য। আমি আংকারা হয়ে ইস্তাম্বুল থেকে এসেছি। ইস্তাম্বুলে এসেছিলাম কয়েক মাস আগে। আজ দুপুরে আপনাদের হ্রদ-শহর 'ভ্যান'-এ এসে পৌঁছেছি। অসুবিধা নেই, আমি হোটেল বা রেস্টহাউজে জায়গা খুঁজে নেব।' বলল আগন্তুক আবু আব্দুল্লাহ।

ড. আজদার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল। একদৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল আবু আব্দুল্লাহর দিকে। বলল, 'আপনি দুপুরে 'ভ্যান'-এ পৌঁছে, সন্ধ্যাতেই আরিয়াসে এসে পৌঁছেছেন। তার মানে, আপনার গন্তব্য আরিয়াস।'

'কেন, আমি আরিয়াস হয়ে অন্য কোথাও যেতে পারি না?' বলল আবু আব্দুল্লাহ।

'তা পারেন। আরিয়াস থেকে ইরান, আর্মেনিয়াও যেতে পারেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর ইরান ও আর্মেনীয় সীমান্ত বন্ধ হয়ে যায়। আপনি ইরান বা আর্মেনিয়ায় যেতে চাইলে রাতটা 'ভ্যান'-এ থেকে সকালে যাত্রা করতেন।' ড. আজদা বলল।

গম্ভীর হলো আগন্তুক আবু আব্দুল্লাহর মুখ। বলল, 'আপনার কথা ঠিক। আমি আরিয়াসে এসেছি।'

'তাহলে আপনি হোটেল খুঁজছেন কেন? আপনি নিশ্চয় ট্যুরিস্ট হিসেবে আরিয়াসে আসেননি। কোন ট্যুরিস্ট এভাবে আসে না। কোথায় এসেছেন আপনি আরিয়াসে?' দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ড. আজদা।

'আমার অনুরোধ, কথা আজ এ পর্যন্তই থাক। এখন কোন আলোচনার সময় নয়। পরে অবশ্যই দেখা হবে। এখন ড. আজদা কিভাবে যাবেন, সেটা বলুন। তার একা যাওয়া ঠিক হবে না। শুনেছেন তো পুলিশ অফিসারের কথা, সাপের লেজে পা দেয়া হয়েছে। ওরা নিশ্চয় সংগে সংগেই জেনে গেছে সব ব্যাপার। ওরা প্রতিশোধের জন্যে নিশ্চয় পাগল হয়ে উঠেছে। ড. বারজেনজো ড. আজদাকে বাড়িতে পৌঁছে দিন।' বলল আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।

উদ্বেগে পাংশু হয়ে উঠেছে ড. আজদা ও ড. বারজেনজো দু'জনেরই মুখ। প্রতিশোধের জন্যে ওদের পাগল হওয়ার যে কথা আগন্তুক বলেছেন, সেটা তারাও জানে।

শুকনো কণ্ঠে ড. বারজেনজো বলল, 'আমি ড. আজদাকে পৌঁছে দিতে পারি। কিন্তু একটা সমস্যা আছে আমাদের। আমাদের মানে আমাদের দু'পরিবারের মধ্যে। আমি যেমন ওর সাথে ওদের বাড়ি যেতে পারি না, তেমনি এত রাতে তার বাড়ি ফেরাও তার পরিবার গ্রহণ করবে না।'

বিস্ময় ফুটে উঠল আগন্তুক আবু আব্দুল্লাহর চোখে-মুখে। বলল, 'কেন, আপনাদের সম্পর্ক কি আপনাদের পরিবার মেনে নিচ্ছে না? প্রবলেমটা কি?'

ড. আজদা ও ড. বারজেনজো দু'জনেরই চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বিব্রত একটা ভাব ফুটে উঠল তাদের চোখে-মুখে।

দু'জনেই মুখ নিচু করেছিল।

মাথা তুলে জবাব দিল ড. বারজেনজো। বলল, 'প্রবলেম হলো দু'পরিবারের রাজনৈতিক বৈরিতা। ড. আজদার গ্র্যান্ডফাদার মোস্তফা বারজানি বিখ্যাত বামপন্থী নেতা এবং কুর্দি বাম রাজনৈতিক আন্দোলন কুর্দি ডেমোক্র্যাট পার্টির ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। আর আমার গ্র্যান্ডফাদার শেখ মাহমুদ বারজেনজো ছিলেন আধুনিক কুর্দিস্থানের প্রথম রাজা এবং কুর্দি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী নেতা। আর আমার নানা সাইয়েদ নুরসি শুধু কুর্দিস্থান নয়, গোটা তুরস্ক ও ইরানের ধর্মীয় নেতা ছিলেন। আমাদের কনজারভেটিভ পরিবারের সাথে ড. আজদার পরিবারের একটা স্থায়ী রাজনৈতিক বৈরিতা আছে, তাছাড়া আমাদের ধার্মিক পরিবারের সাথে ড. আজদাদের ধর্মনিরপেক্ষ পরিবারের রয়েছে যোজন যোজন মানসিক পার্থক্য। এই সমস্যার কারণে আমাদের সম্পর্কের কথা আমরা পরিবারকে বলার অবস্থাতেও নেই।' থামল ড. বারজেনজো।

'আর আপনারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও বিয়ে করতে পারছেন না পরিবারকে বাদ দিয়ে।' বলল আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।

'ঠিক তাই। আমরা পরিবারকে মাইনাস করার কথা কল্পনাও করতে পারি না।' বলল ড. আজদা। ভারি কণ্ঠ তার।

‘বুঝেছি। এই কারণেই ড. বারজেনজো ড. আজদার বাড়ি যেতে পারছেন না। আবার এত রাতে ড. আজদাও একা বাড়িতে যেতে পারেন না, কথা উঠবে। তাহলে উপায় কি এখন?’

‘মি. আবু আব্দুল্লাহ, উপায় আপনিই করতে পারেন। আপনার থাকার জায়গা প্রয়োজন। আপনি ড. আজদার সাথে চলুন। আপনার থাকার জায়গাও হলো আর ড. আজদার সমস্যারও সমাধান হলো।’ বলল ড. বারজেনজো।

ড. আজদার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। যেন অন্ধকারে আলোর সন্ধান পেল। বলল, ‘উনি ঠিক বলেছেন স্যার। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমার বাড়িতে আপনার কোনই অসুবিধা হবে না, যদিও এটা আমাদের গ্রামের বাড়ি। আমার ফুপা-ফুপি এসেছেন গতকাল, আজ মামা এসেছেন। তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আপনি ভালো সঙ্গও পাবেন স্যার।’

‘আমিও আপনাদের অনেক দূর এগিয়ে দিতে পারব। চলুন, যাওয়া যাক।’ ড. বারজেনজো বলল।

আবু আহমদ আব্দুল্লাহর ছদ্মনামের আড়ালে আহমদ মুসা মনে মনে খুশিই হলো। সে তো ড. আজদার সন্ধানে ড. আজদার বাড়িতেই যাচ্ছিল। দুপুরে ‘ভ্যান’ লেক-শহরে পৌঁছার পরই আহমদ মুসা আরা আরিয়াস অঞ্চলের নাগরিক তালিকা সার্চ করে ড. আজদা আয়েশার ঠিকানা যোগাড় করেছে। সেই ঠিকানাতেই যাচ্ছিল সে। ‘মেঘ না চাইতেই পানি’র মত সেই বাড়িতেই যাওয়ার সুযোগ হলো তাদের মেহমান হয়ে। বলল আহমদ মুসা, ‘ঠিক আছে, আমার আপত্তি করার কোন যুক্তি নেই।’

‘ধন্যবাদ মি. আবু আব্দুল্লাহ।’ বলল ড. বারজেনজো।

‘অনেক ধন্যবাদ স্যার। চলুন, যাওয়া যাক স্যার।’ বলল ড. আজদা।

সবাই তাদের গাড়ির দিকে এগোলো।

‘ড. বারজেনজো, আপনার সাথে আবার কিভাবে দেখা হবে? আমার কিছু প্রয়োজন আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

ড. বারজেনজো হাসল। বলল, ‘আমার মনেও কিছু প্রশ্ন, কিছু কৌতুহল আছে। আপনার সাথে দেখা হওয়া আমারও প্রয়োজন।’

ড. বারজেনজোর কথা শেষ হতেই ড. আজদা বলে উঠল, 'আমার তো অনেক কৌতুহল, অনেক প্রশ্ন আছে। আলহামদুলিল্লাহ্, কৌতুহল মেটানোর সুযোগ পেয়ে গেলাম।'

'আলহামদুলিল্লাহ' বলে আহমদ মুসা ড. বারজেনজোকে লক্ষ্য করে বলল, 'তাহলে কিভাবে কোথায় দেখা হচ্ছে মি. বারজেনজো?'

'ভেবে চিন্তে কাল সকালে ড. আজদার টেলিফোনে জানাব।' বলল ড. বারজেনজো।

'ধন্যবাদ।' আহমদ মুসা বলল।

সালাম বিনিময়ের পর সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠল।

আহমদ মুসা উঠল ড. আজদার গাড়িতে।

আহমদ মুসা তার ভাড়া করা গাড়ি থানা পর্যন্ত পৌঁছে ছেড়ে দিয়েছিল।

চলতে শুরু করল দু'টি গাড়ি।

আগে আজদার গাড়ি, পেছনে ড. বারজেনজোর গাড়ি।

স্বপ্ন দেখছিল আহমদ মুসা।

দেখছিল, দু'জন মুখোশধারী লোক ড. আজদাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। ড. আজদা প্রাণপণে 'স্যার', 'স্যার' বলে চিৎকার করছিল।

'দাঁড়াও', 'দাঁড়াও' বলে ঘুমের মধ্যেই উঠে বসেছে আহমদ মুসা।

ঘুম ভেঙে গেল তার।

স্বপ্ন নয়, এবার বাস্তবেও ড. আজদার 'স্যার', 'স্যার' চিৎকার শুনতে পেল সে। একদম তার দরজার সামনে। মনে হচ্ছে, কেউ তাকে তার দরজার সামনে থেকেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

আঙ্কারা থেকে বিদায়ের সময় জেনারেল মোস্তফার দেয়া লেটেস্ট ভার্শন এম-১০ মেশিন রিভলভারটি বালিশের তলা থেকে বের করে হাতে নিয়ে জ্যাকেটটা গায়ে চাপিয়ে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল সে।

ডান হাতে রিভলভার বাগিয়ে ধরে বাম হাত দিয়ে দরজার নব ঘুরিয়ে এক ঝটকায় খুলে ফেলল দরজা। আহমদ মুসা দেখতে পেল, তার দরজা সোজা করিডোর দিয়ে দু'জন মুখোশধারী টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে ড. আজদা আয়েশাকে।

আহমদ মুসা ওদিকে এগিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে এমন সময় বাঁ দিক থেকে একটা ধাতব শব্দে সেদিকে ফিরে তাকাল। দেখল, তার দিকে রিভলভার তুলেছে একজন মুখোশধারী সন্ত্রাসী। তার রিভলভারের সেফটি ফ্ল্যাসপপিন তোলারই শব্দ পেয়েছে সে। তার মানে গুলি আসছে।

চিন্তার মতই দ্রুত আহমদ মুসা বাম দিকে ফ্লোরের ওপর নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। গুলিটা যেন তার ডান কাঁধ ছুঁয়েই বেরিয়ে গেল। মুহূর্ত সময়ের দূরত্বে মাথাটা বেঁচে গেল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার দেহটা মাটি স্পর্শ করার আগেই তার ডান হাতের এম-১০ রিভলভার গুলি করেছিল সন্ত্রাসীকে লক্ষ্য করে যাতে সে দ্বিতীয় গুলি করার সুযোগ না পায়।

তার পাশেই আরেকজন সন্ত্রাসী দাঁড়িয়েছিল। তার রিভলভার তাক করেছিল কয়েকজন ভীতসন্ত্রস্ত নারী-পুরুষকে। তারা ড. আজদার ফুপি, ফুপা, মামা ও মামাতো ভাই-বোনরা হবেন।

ড. আজদার পিতা ইঞ্জিনিয়ার নাফী আগা বারজানী এবং মাতা লায়লা আজদা বারজানী থাকেন সোভিয়েত ইউনিয়নে দীর্ঘদিন ধরে। সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানীর তিনি একজন শীর্ষ ইঞ্জিনিয়ার। শোনা যায়, তারা কমিউনিস্ট পার্টি করেন।

আহমদ মুসা দেহটা মাটিতে পড়ার পর দ্বিতীয় গুলিটা করল দ্বিতীয় সন্ত্রাসীকে লক্ষ্য করে।

সন্ত্রাসীও রিভলভার উঁচিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু তার গুলি করার সুযোগ হলো না। তার আগেই বুকে গুলি খেয়ে ভূমি শয্যা নিল।

যে দু'জন সন্ত্রাসী ড. আজদাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা ড. আজদাকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

তাদের দু'জনের রিভলভারই তাক করেছে আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা ঘুরে ওদের তাক করার আগেই ওদের রিভলভার থেকে গুলি শুরু হলো।

আহমদ মুসা ফুটবলের মত দ্রুত গড়িয়ে গুলি যে দিক থেকে আসছে, সেদিকেই এগোলো। ঐদিকেই লাউঞ্জের পাশে করিডোরের প্যারালালে একটা পিলার রয়েছে। পিলারটাই আহমদ মুসার টার্গেট।

পিলারের আড়ালে গিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

ওদের গুলি বন্ধ হয়নি।

ওরা গুলি চালাতে চালাতেই এগিয়ে আসছে। কাছে এসে দু'দিক থেকে তাকে টার্গেট করার আগেই ওদের ঠেকাতে হবে, ভাবল আহমদ মুসা

আহমদ মুসা মুহূর্তকাল স্থির হয়ে দাঁড়ানোর পর দু'পাশের গুলির রেঞ্জ দেখে নিয়ে তার এম-১০ মেশিন রিভলভারের অটোমেটিক ফ্ল্যাসপপিন অন করে ওদের গুলির রেঞ্জ থেকে রিভলভারটা ওপরে তুলে ওদের গুলির শব্দ লক্ষ্যে রিভলভারের নল কৌণিক এ্যাংগেলে স্থির করে ট্রিগার চেপে ধরল তর্জনী দিয়ে।

রিভলভার থেকে অব্যাহত গুলির ঝাঁক বেরিয়ে যেতে লাগল। নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে তার রিভলভারের নল ঘুরতে লাগল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

ওদের গুলি থেমে গেল।

চকিতে উঁকি দিয়ে ওদিকে তাকাল আহমদ মুসা। দেখল, দু'জন রিভলভারধারী মেঝেতে গড়িয়ে গড়িয়ে পেছন দিকে সরে যাচ্ছে। ওরা আহত হয়েছে মনে হলো। কিন্তু ড. আজদাকে দেখতে পেল না আহমদ মুসা। এদিকে নিশ্চয় আসেনি। তাহলে?

চমকে উঠল আহমদ মুসা। তাহলে কি আরও সন্ত্রাসী ছিল? তারা ড. আজদাকে নিয়ে গেছে!

আর ভাবতে পারল না আহমদ মুসা।

সে গুলি করতে করতেই এগোলো গড়িয়ে চলা ওই দু'জনের দিকে। ওদিক দিয়েই বাইরে বেরুবার পথ।

এ সময় ড. আজদার মামা ও ফুপারা ছুটে এল। ওরা চিৎকার করে বলল, 'দু'জন সন্ত্রাসী ড. আজদার মুখ চেপে ধরে বের করে নিয়ে গেছে এই মাত্র।'

আহমদ মুসা ছুটল বাইরে বেরুবার জন্যে।

সন্ত্রাসী দু'জনের দেহ লাফ দিয়ে ডিঙানোর সময় দেখল, দু'জনের দেহই ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। বাইরের বারান্দায় এসে পৌঁছতেই দেখতে পেল, একটা গাড়ি দ্রুত চলে যাচ্ছে। চিৎকার শুনতে পেল ড. আজদার।

উপায় নেই দৌঁড়ে গিয়ে গাড়িকে ধরার।

রিভলভার তুলল আহমদ মুসা। অটোমেটিক ফ্ল্যাসপপিন অন করাই ছিল। ট্রিগার চাপল আহমদ মুসা।

বসে পড়ে মাটির এক ফুট উঁচু দিয়ে মাটির সমান্তরালে গুলি ছুঁড়েছিল আহমদ মুসা।

পেছন থেকে মাইক্রোর টায়ারে গুলি লাগানো খুব কঠিন। তবু তাড়াহুড়োর মধ্যে যা করেছে, এর বেশি কিছু করা যেত না। আল্লাহ ভরসা।

ভরসা ব্যর্থ হলো না। মুহূর্তের ব্যবধান। টায়ার ফাটার বিকট একটা শব্দ হলো।

ছুটল আহমদ মুসা গাড়ির দিকে।

গাড়িটির গতি বেশি ছিল না। তাই টায়ার ফাটার পর গাড়িটি কয়েকগজ গিয়ে থেমে গেল।

আহমদ মুসা গাড়ির কাছে পৌঁছার আগেই মাইক্রোর দু'পাশের দরজা খুলে তিনজন বেরিয়ে এল। এপাশে নেমেছিল দু'জন। দু'জনের হাতে দু'টি স্টেনগান।

তারা নেমেই আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়ে স্টেনগান তুলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু আহমদ মুসা তার লেটেস্ট মডেলের এম-১০ মেশিন রিভলভার বাগিয়ে ধরেই দৌঁড়াচ্ছিল। শুধু ট্রিগার টিপতেই এক ঝাঁক গুলি গিয়ে ঘিরে ধরল ঐ দু'জনকে।

তৃতীয় জন বেরিয়েছিল ওপাশ দিয়ে। আহমদ মুসা তাকে দেখতে পায়নি।

গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে সে তার রিভলভার তুলেছিল।

তখন গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল ড. আজদাও। সে দেখতে পেয়েছিল গাড়ির আড়ালে দাঁড়ানো লোকটিকে। সে লোকটির রিভলভারের লক্ষ্য দেখেই চিৎকার করে উঠেছিল, 'গুলি, মি. আবু আব্দুল্লাহ।'

শেষ মুহূর্তেই মুখ তুলেছিল আহমদ মুসা। দেখতে পেয়েছিল লোকটির রিভলভারের নল। কিছুই করার ছিল না। কিন্তু দেহের দুর্বোধ্য সতর্কতা কোন অশরীরী নির্দেশে পলকেই দেহটাকে বাঁকিয়ে নিয়েছিল ডান দিকে।

গুলিটা এসে বিদ্ধ করল আহমদ মুসার বাম বাহুকে।

দেহটা একবার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল আহমদ মুসার। যেন সে বুকেই গুলি খেয়েছে, এমন অবস্থা নিয়ে সে আছড়ে পড়ল। কয়েকবার কাতরানোর মত দেহটা এদিক-ওদিকে নড়িয়ে স্থির করে ফেলল দেহটাকে। লক্ষ্য, লোকটাকে আড়াল থেকে বের করে আনা।

আহমদ মুসার গুলি খেয়ে পড়ে যাওয়া গাড়ির আড়ালে দাঁড়ানো সন্ত্রাসীও দেখেছে। সে লাফ দিয়ে গাড়ির ওপর দিয়ে এপারে এসে ড. আজদার সামনে দাঁড়াল। তার মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে বলল, 'ওর মত যদি মরতে না চাও তাহলে চল। এক মুহূর্ত দেরি করলে মাথা উড়িয়ে দেব।'

ভয় ও উদ্বেগে কাঠ হয়ে যাওয়া ড. আজদা গাড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়াল যন্ত্রচালিতের মত।

আহমদ মুসা একটা গুলি করল। গুলিটা সন্ত্রাসীটির কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। গুলির উত্তাপ যেন পেল সে।

চমকে উঠে পেছনে ফিরে তাকাল সন্ত্রাসীটি।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল তখন। তার রিভলভার তাক করাই ছিল সন্ত্রাসীটির দিকে। বলল আহমদ মুসা, 'হাতের রিভলভার ফেলে দিয়ে হাত তুলে...।'

কথা শেষ করতে পারল না আহমদ মুসা। সন্ত্রাসী লোকটির রিভলভার বিদ্যুৎ বেগে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে ওপরে উঠল।

আহমদ মুসার কথা বন্ধ হয়ে গেল এবং সাথে সাথেই তার তর্জনী রিভলভারের ট্রিগারে চেপে বসল।

সন্ত্রাসী লোকটি আহমদ মুসার লক্ষ্যে রিভলভার তুলেছিল ঠিকই। কিন্তু ট্রিগার টেপার সময় হলো না। তার আগেই আহমদ মুসার রিভলভারের গুলি তার কপালে এসে বিদ্ধ হলো।

লোকটির দেহ এদিক-ওদিক কয়েকবার দোল খেয়ে খসে পড়ল মাটির ওপর।

ড. আজদা ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসার বাম বাহু রক্তে ভেসে যাচ্ছিল।

'স্যার আপনি ভালো আছেন? একি হলো! গুলি লেগেছে আপনার?' আর্তকণ্ঠে বলে উঠল ড. আজদা আহমদ মুসার কাছে এসে।

ড. আজদার ফুপি, ফুপা, মামা সকলে ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে।

ড. আজদার ফুপি কেঁদে উঠে বলল, 'বেটা যেন সাক্ষাৎ আল্লাহর ফেরেশতা। সে আমাদের আজদাকে আবার বাঁচাল। বাঁচাল আমাদের পরিবারকে। একি হলো তার! কেমন আছ বাছা তুমি!'

আহমদ মুসা হাতের রিভলভার পকেটে রেখে বলল, 'আমাকে নিয়ে আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমার তেমন কিছুই হয়নি।' মুখে হাসি নিয়ে বলল আহমদ মুসা।

ড. আজদারা আহমদ মুসার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হলো। সদ্য গুলিবিদ্ধ একজন মানুষের চেহারা এমন বেদনাহীন, স্বচ্ছ ও হাসিমাখা হতে পারে না। তাহলে কি গুলি লাগেনি! রক্ত কিসের তাহলে!

ওদের কারও মুখেই যেন কথা জোগাল না।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল, ড. আজদাকে লক্ষ্য করে, 'ড. আজদা, এখনি থানায় টেলিফোন করা দরকার।'

থানার কথা শুনতেই ড. আজদাসহ সকলের মুখে উদ্বেগ নেমে এল। বলল আজদা ভীতকণ্ঠে, 'স্যার এতগুলো লোক মারা গেল। পুলিশ এলে কি ঘটবে স্যার! খুব ভয় করছে। গত রাতেও ওদের ব্যবহার দেখেছি।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এর মধ্যেও গত রাতের কথা আপনার মনে পড়েছে? ভাববেন না। আমি আমার রিভলভার দিয়ে ওদের সাতজনকেই হত্যা করেছি। আমি ওদের এটাই বলব।’

গম্ভীর হলো ড. আজদার মুখ। বলল, ‘তাহলে আমাদের ভাবনাই আমরা ভাবব। আপনার ভাবনা আমরা ভাবতে পারবো না।’ কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল ড. আজদা।

‘মা আজদা ঠিকই বলেছে। আপনি আমাদের জন্যে সব করলেন নিজের জীবন বিপন্ন করে। গুলিটা আপনার বাহুতে না লেগে বিপজ্জনক কোন জায়গায় লাগতে পারতো! আপনার কথাই তো আমাদের সবার আগে ভাবতে হবে। আসুক পুলিশ।’ বলল ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী।

একটু থেমেই সে আবার বলল, ‘আমিই যাচ্ছি পুলিশকে টেলিফোন করতে।’

বলেই সে দ্রুত এগোলো বাড়ির দিকে।

‘পুলিশ যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ আমরা বাইরেই দাঁড়াব। যেখানে যা কিছু যেমন আছে, তেমনি থাকা দরকার।’ বলল আহমদ মুসা সবাইকে লক্ষ্য করে।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা এগোলো গাড়ির পাশে পড়ে থাকা তিনটি লাশের দিকে।

আহমদ মুসা নিহত তিনজনেরই জামার বোতাম খুলে বাহু পরীক্ষা করল। তারপর জামার বোতাম লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এল ড. আজদাদের কাছে।

‘আপনি ওদের বাহুতে কি খুঁজলেন? আহত বাহু নিয়ে এসব করছেন কেন? রক্তক্ষরণ এখনও বন্ধ হয়নি।’ বলল ড. আজদার ফুপা।

ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি একজন রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী। বিরাট সম্পত্তির মালিক। ইদানীং তিনি আংকারায় ব্যবসা করছেন। সেখানেও তিনি বাম আন্দোলনের সাথে যুক্ত।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘পুলিশ এসে পড়লে ঐ অনুসন্ধান করা যেত না। আমি ওদের দেহে একটা চিহ্ন খোঁজ করছিলাম।’

‘চিহ্ন? কি চিহ্ন?’ বলল ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি।

আহমদ মুসা একটু ভাবল। একটু গাম্ভীর্য নেমে এল চোখে-মুখে। বলল, ‘বড় বড় অনেক গ্যাং-এর দেহে দলীয় চিহ্ন থাকে। সেরকম কোন দলের লোক কিনা ওরা, সেটাই দেখলাম।’

ড. আজদার ফুপা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময় দু’টি হেডলাইট ড. আজদাদের বাগানের গেট পেরিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছিল।

থেমে গেল ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি।

‘নিশ্চয় পুলিশ আসছে।’ বলল আহমদ মুসা।

পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল সন্ত্রাসীদের মাইক্রোর ঠিক পেছনেই।

পুলিশের দু’টি গাড়ি। একটা জীপ, অন্যটি একটা ক্যারিয়ার।

জীপ থেকে নামল লোকাল থানার অফিসার ইনচার্জ। ক্যারিয়ার থেকে লাফ দিয়ে নামল কয়েকজন পুলিশ।

ড. আজদার বাড়ির সামনের লন-কাম-বাগানটিতে বিদ্যুতের দু’টি খুঁটি। গোটা বাগানই আলোকিত। গাড়ি বারান্দাতেও আলো। তার ফলে বাড়ির দেয়াল সবটাই আলোতে ঝলমল করছে।

মাইক্রোর একটু সামনেই দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা ও ড. আজদারা।

পুলিশ অফিসার গাড়ি থেকে নামলে ড. আজদা ও তার মামারা পুলিশ অফিসারের দিকে এগোতে লাগল।

পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান কয়েক গজ এগিয়ে ড. আজদাদের সামনে এসে ড. আজদাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আপনিই তো ড. আজদা, ইঞ্জিনিয়ার নাফী আগা বারজানির মেয়ে? আপনাকেই কিডন্যাপের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে?’

‘হ্যাঁ অফিসার।’ বলল ড. আজদা।

‘আপনার সাথে এরা কারা?’ পুলিশ অফিসার ওকালান বলল। তার চোখে সন্ধানী দৃষ্টি।

ড. আজদা মামা, ফুপা সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিল। আর আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, ‘আবু আহমদ আব্দুল্লাহ। আমার মেহমান।’

সেই সাথে ড. আজদা গত রাতে তাকে কিডন্যাপের চেষ্টার ঘটনাও বলতে গেল।

'আমি সে ঘটনা জানি মিস বারজানি। আমাকে জোনাল পুলিশ থেকে সব জানানো হয়েছে। তাহলে আপনার এই মেহমানই গত রাতে আপনার সাথে জোনাল পুলিশ অফিসে গিয়েছিলেন?' বলল পুলিশ অফিসার।

'জ্বি হ্যাঁ। ঘটনার সময় চলার পথে উনিও সেখানে দাঁড়ান। ইন্সপেক্টর দারাগ সব জানেন।' ড. আজদা বলল।

'কালকের ঘটনা জানেন, তবে সব জানেন না। উনি তো এ এলাকার লোক নন।'

একটু থেমেই আবার বলল, 'এখানে তিনটি লাশ আর চারটি লাশ কোথায়?'

'আর চারটি লাশ ভেতরে।' বলল ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী।

'চলুন, দেখব।' পুলিশ অফিসার বলল।

'আসুন।' বলল ড. সাহাব নুরী।

চলার জন্যে পা তুলে পুলিশদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের দু'জন আমার সাথে এস। আর অবশিষ্টরা বাইরে পাহারায় থাক। গাড়ি, লাশগুলো, হাতিয়ার যা যেমন যেখানে আছে তেমনই থাকবে।'

মাত্র জনাচারেক পুলিশ ছাড়া সবাই পুলিশ অফিসারের সাথে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরে ঢুকে ডান পাশে ড্রইংরুম ও বাম পাশে গেস্টরুমের মাঝে করিডোরটা পেরোলেই বেশ বড় একটা লাউঞ্জ। লাউঞ্জের অন্য তিন দিক দিয়েও ঘর। আবার দু'তলায় ওঠার সিঁড়িও এই লাউঞ্জ থেকেই। সন্ত্রাসীরা পানির পাইপ বেয়ে ছাদে উঠেছিল। তারপর চিলে-কোঠার তালা ভেঙে দু'তলায় প্রবেশ করেছিল। দু'তলায় তিনটি মাস্টার বেড আছে। তার একটি থেকে ড. আজদাকে ধরে নিয়ে লাউঞ্জে নেমে পালানোর চেষ্টা করেছিল। লাউঞ্জের পূর্ব প্রান্তের গেস্টরুম থেকেই বেরিয়ে এসেছিল আহমদ মুসা।

লাল কার্পেটে মোড়া লাউঞ্জটা বলতে গেলে ফাঁকাই। গুচ্ছাকারে সাজানো কয়েকটা সোফা সেট রয়েছে মাত্র।

বাইরের লাশগুলো যেভাবে দেখেছে, সেভাবে এ লাশগুলোও ঘুরে ঘুরে দেখে পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান বলল, 'এরা যদি সন্ত্রাসী হয়, তাহলে সন্ত্রাসীরা খুন হয়েছে তিন পর্যায়ে। প্রথমে লাউঞ্জে সিঁড়ির গোড়ায়, তারপর লাউঞ্জের এ প্রান্তে করিডোরের মুখে। সর্বশেষে বাইরে গাড়ির কাছে।'

কথাগুলো শেষ করেই পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করল ড. আজদাদের দিকে চেয়ে, 'কথিত সন্ত্রাসীরা ড. আজদাকে কিডন্যাপ করার আগে আপনারা কে কোথায় ছিলেন?'

জবাব দিল ড. আজদা। বলল, 'দু'তলায় আমার আব্বা যে মাস্টার বেডে থাকতেন, তার কাছাকাছি ফ্যামেলি গেস্টরুমে ছিলেন আমার ফুপা-ফুপি। আমার ভাইয়ের মাস্টার বেডটায় ছিলেন আমার মামা। আমি ছিলাম আমার মাস্টার বেডে। আর নিচতলার গেস্টরুমে ছিলেন আমাদের মেহমান জনাব আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।'

'কথিত সন্ত্রাসীরা আক্রান্ত হয়েছিলেন লাউঞ্জে নামার পর। তারা আক্রান্ত হয়েছিলেন নিচ থেকে। তার মানে আপনাদের মেহমান আবু আহমদ আব্দুল্লাহ ড. আজদাকে রেসকিউ করতে এগিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসীদের তিন পর্যায়ের যে হত্যাকাণ্ড তা তিনিই কি করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান।

সংগে সংগে প্রশ্নের উত্তর এল না কারও কাছ থেকেই। ড. আজদা তাকাল তার মামা, ফুপা ও আহমদ মুসার দিকে।

উত্তর দিল আহমদ মুসা। বলল, 'আপনার অনুমান সত্য অফিসার। সব সন্ত্রাসীকে হত্যা আমিই করেছি।' স্বচ্ছ, সাবলীল কণ্ঠস্বর আহমদ মুসার।

'সন্ত্রাসীরা বোধ হয় আপনাকে দেখেই তাদের হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়েছিল! আর সেই সুযোগে ধীরে-সুস্থে দেখে-শুনে আপনি তাদের হত্যা করেছেন।' বলল পুলিশ অফিসার। তার কণ্ঠে বিদ্রুপের সুর।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ বিষয়টা আপনারাই ভালো জানেন। ক্রিমিনালদের ডীল করাই আপনাদের প্রাত্যহিক কাজ।’

মুখটা গম্ভীর হলো পুলিশ অফিসারের। কিন্তু উত্তরে কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল পুলিশ অফিসার। বলল দু’জন পুলিশকে লক্ষ্য করে, ‘তোমরা এই লাউঞ্জে পাহারায় থাক। সবকিছু যেমন আছে, তেমন থাকবে।’

তারপর তাকাল ড. আজদাদের দিকে। বলল, ‘আপনারা কেউ কোথাও যাবেন না। এই ঘরেই অপেক্ষা করবেন। আরারাত রিজিওন ইজডির একজন শীর্ষ পুলিশ অফিসার ‘ডাইরেক্টর অব পুলিশ’ খাল্লিকান খাচিপ এখনি এসে পড়বেন। গোটা বিষয়টা তিনিই দেখবেন। আমি এর মধ্যে বাইরেটা একটু ঘুরে দেখি।’

বলে পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান বেরিয়ে গেলেন।

লাউঞ্জের দু’পাশে দু’জন পুলিশ তাদের হাতের স্টেনগান নিয়ে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

কয়েকটা সোফায় কাছাকাছি বসে আছে ড. আজদারা।

ড. আজদাদের মুখ বিষণ্ন। তাদের কারও মুখে কোন কথা নেই।

তাদের সকলের মনেই ঘটনার পরিণতি নিয়ে তোলপাড় চলছে।

কিন্তু আহমদ মুসার চোখে-মুখে কোন ভাবান্তর নেই। পুলিশ অফিসার তার উদ্দেশ্যে যে তীর্যক কথাগুলো বলেছে, তাতে বরং মজাই পেয়েছে আহমদ মুসা। কিন্তু আরারাত রিজিওন ইজডির পুলিশ অফিসারের ‘খাল্লিকান খাচিপ’ নামের এই শেষ অংশ ‘খাচিপ’ তার মনে একটা ধাক্কা দিয়েছে। ‘খাল্লিকান’ শব্দ টার্কিশ, কিন্তু ‘খাচিপ’ শব্দটি যতদূর তার মনে পড়ছে আর্মেনীয়। আহমদ মুসা আর্মেনিয়া থাকার সময় একদিন গিফটশপে সেলসম্যানের কাছে একজনকে ‘খাচিপ’ চাইতে শুনেছিল। সেলসম্যান তাকে একটি ছোট ক্রস দিয়েছিল। আহমদ মুসা তার আর্মেনীয় সাথীকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিল, ‘খাচিপ’ অর্থ ‘ছোট ক্রস’। তবে এই প্রাচীন আর্মেনীয় শব্দ নাকি এখন প্রায় ব্যবহার হয় না বললেই চলে।

কিন্তু প্রাচীন ‘খাচিপ’ মানে ‘ছোট ক্রস’ এই শব্দটি এই পুলিশ অফিসারের নামের সাথে কেন? এ শব্দের কি কোন ভিন্ন টার্কিশ অর্থ আছে!

এই ভাবনাতেই বুঁদ হয়ে গিয়েছিল আহমদ মুসা।

বুটের আওয়াজ তুলে মোস্তফা ওকালানসহ কয়েকজন পুলিশ অফিসার ভেতরে প্রবেশ করল, তখনই সম্বিত ফিরে পেল আহমদ মুসা।

ড. আজদারা সবাই পুলিশ অফিসারদের স্বাগত জানাল।

পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালানের পাশের অপেক্ষাকৃত লম্বা গড়নের ভিন্ন রকমের পুলিশ অফিসারকে দেখে বুঝল, সেই হবে 'ইজডির' রিজিওনের 'ডাইরেক্টর অব পুলিশ' (ডিওপি) খাল্লিকান খাচিপ।

ড. আজদাদের কাছাকাছি হয়েই সেই পুলিশ অফিসার খাল্লিকান খাচিপ ড. আজদাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনাদের নিয়ে এসব কি হচ্ছে মিস আজদা? আপনারা কুর্দিস্থান ও তুরস্কের বিখ্যাত ও সম্মানিত একটা ফ্যামেলি। এই ফ্যামেলির মুখে আপনারা চুনকালি মেখে দিলেন। আপনার ভাই আতা সালাহ উদ্দিন বারজানি ড্রাগ ব্যবসা করে জেলে গেলেন। আর আপনাকে নিয়ে একের পর এক ভয়াবহ ঘটনা। ভাগ-জোক নিয়ে এসব আপনাদের ইনফাইটিং নয় তো? যারা মারা গেছে, আপনারা যারা বেঁচে আছেন সবাই কি এক দলের? এমন প্রশ্ন উঠছে কারণ ড্রাগ ব্যবসা ব্যাপক হওয়ার আগে এ ধরনের ঘটনা আরিয়াস, ইজডির কেন গোটা তুরস্কেও ঘটেনি।'

ভয় ও বিব্রতকর অবস্থা ড. আজদার। কোন কথাই সে বলতে পারলো না।

ড. আজদার ফুপা কামাল বারকির চোখে প্রতিবাদের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। বলল সে, 'কিন্তু অফিসার, আমাদের কথা না শুনে, ঘটনা ভালো করে না জেনেই তো আপনি মন্তব্য করছেন।'

অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠল ডিওপি খাল্লিকান খাচিপের চোখে-মুখে। বলল, 'আমি শুনে এবং জেনেই কথা বলছি জনাব। আরও বলতে চাই, ড্রাগ সিন্ডিকেটের এই ইনফাইটিং-এ আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে হায়ার করে আনা হয়েছে।'

কথা শেষ করেই ডিওপি খাল্লিকান খাচিপ থানার ইনচার্জ মোস্তফা ওকালানকে বলল, 'আপনি সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে ফেলুন তাড়াতাড়ি।

তাড়াতাড়ি লাশগুলো ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে আমরা এদের সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে পুলিশ অফিসে নিয়ে যেতে চাই।'

আবার ড. আজদার দিকে ডিওপি খাল্লিকান খাচিপ তাকাল। বলল, 'আপাতত আপনাকে ও আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে আমরা গ্রেফতার করছি। জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তে ড্রাগ ব্যবসায় ও ড্রাগ সিন্ডিকেটে যদি আপনাদের সংশ্লিষ্টতা না থাকে, তাহলে আপনারা সম্মানের সাথে ছাড়া পেয়ে যাবেন।'

উদ্বেগ-আতংকে ফ্যাকাশে হয়ে গেল ড. আজদা ও অন্যদের মুখ।

পুলিশ অফিসারের এমন সরাসরি ও নগ্ন পক্ষপাতিত্বমূলক হস্তক্ষেপে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। বলল ডিওপি খাল্লিকান খাচিপকে লক্ষ্য করে, 'তুরস্কের আইনে কি বাদী ও আসামীকে একসাথে গ্রেফতার করতে হয়? আক্রান্ত ও আক্রমণকারীকে কি একচোখে দেখতে হয়?'

যেন চাবুকের একটা বড় ঘা খেল ডিওপি খাল্লিকান খাচিপ। একটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আহমদ মুসার দিকে তীব্র কণ্ঠে তাকিয়ে বলল, 'আপনি যে রিভলভার দিয়ে এদের হত্যা করেছেন, সে রিভলভার কোথায়?'

আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলভার বের করে ডিওপি খাল্লিকান খাচিপকে দেখাল।

ভ্রূকুঞ্চিত হলো ডিওপি খাচিপের। বলল ত্বরিত কণ্ঠে, 'এ রিভলভার আপনি পেলেন কোথায়? পুলিশও এ রিভলভার পায়নি। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা ছাড়া সাধারণের কাছে এটা বিক্রির প্রশ্নই ওঠে না। নিশ্চয়ই লাইসেন্স নেই এ রিভলভারের।'

আহমদ মুসার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। জ্যাকেটের পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে এগিয়ে দিল ডিওপি খাচিপের দিকে।

ডিওপি খাচিপ কাগজটা হাতে নিয়ে চোখ বোলাল। বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। বলল, 'স্টেট সিকিউরিটি সার্ভিসের হেডকোয়ার্টার থেকে পারমিশন ইস্যু হয়েছে? ওখানে কি আপনার লোকজন আছে? কিংবা কাগজটা নকল নয়তো?'

‘সেরকম মনে করলে সেখানে একটা টেলিফোন করুন না। টেলিফোন নাম্বারটা তো আছেই।’ বলল আহমদ মুসা।

মুখটা চুপসে গেল পুলিশ অফিসারের। তাকাল একবার সে আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘টেলিফোন করার প্রয়োজন নেই। কোন কিছু নিশ্চিত করার পুলিশদের নিজস্ব পদ্ধতি আছে।’

ডিওপি খাল্লিকান খাচিপের কথার মাঝখানেই লোকাল থানা ইনচার্জ মোস্তফা ফিরে এলেন। ডিওপি খাচিপের কথা শেষ হতেই সে বলল, ‘স্যার, সুরতহাল রিপোর্ট কমপ্লিট।’

‘আলামতগুলো সব নেয়া হয়েছে?’ জিজ্ঞাসা ডিওপি খাচিপের।

‘জ্বি, লাশগুলোও সব নেয়া হয়েছে।’ বলল থানা ইনচার্জ মোস্তফা ওকালান।

ডিওপি খাচিপ থানা ইনচার্জ মোস্তফা ওকালানের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল ড. আজদাদের দিকে। বলল, ‘তাহলে ড. আজদা ও মি. আবু আহমদ, আপনাদের যেতে হবে আমাদের সাথে।’

‘কোথায়?’ ড. আজদা কিছু বলার আগেই আহমদ মুসা বলল কথাটা।

‘আমার অফিসে খুব বড় ঘটনা এটা। আপনাদের স্টেটমেন্ট নিতে হবে।’

‘আমরা যাব থানায়। মামলা দায়েরের জন্যে। মামলার বিবরণীতে আমাদের সব কথা এসে যাবে। আমাদের স্টেটমেন্ট লাগবে না। এরপরও স্টেটমেন্ট নিতে চাইলে এখানেই নিতে হবে।’

মুহূর্তের জন্যে ভ্রূকুঞ্চিত হলো ডিওপি খাল্লিকান খাচিপের। ভাবনার একটা ছায়াও ফুটে উঠল তার মুখে। বলল, ‘আপনি যা বলছেন সেভাবেও হয়। আমি মনে করেছিলাম, আপনারা গেলে কেস নিয়ে আরও কথা হতো। আর সরকারিভাবেও তো কেস হচ্ছে, আপনাদের কেস করার দরকার আছে কি?’

‘সরকারি কেস এক ধারায়, আমাদের কেস হবে ভিন্ন ধারায়। সরকারি কেসের মূল কথা হবে, কিডন্যাপের চেষ্টা এবং এ চেষ্টা করতে গিয়ে ৭ জন কিডন্যাপার খুন, এ কিডন্যাপের মোটিভ কি, আর এর পেছনে আর কে আছে ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের কেসের মূল বক্তব্য হবে, আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র চলছে। এ পরিবারের ছেলে ড্রাগট্রেডের মিথ্যা অভিযোগে জেলে আছে। বাড়িতে ড্রাগ লুকিয়ে রেখে ড. আজদাকে ফাঁসাতে চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু যে ড্রাগ রাখতে এসেছিল, সে ধরা পড়ে যায়। তাকে থানায় নেয়ার পথে তাকে ষড়যন্ত্রকারীরাই হত্যা করে যাতে তাদের ষড়যন্ত্র ধরা পড়া ছেলেটি ফাঁস করে না দেয়। এরপর ড. আজদা ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা গত সন্ধ্যায় এবং আজ রাতে আবার আক্রান্ত হয়েছেন। এ ষড়যন্ত্রকারীরা শুধু এ পরিবার নয়, আরিয়াস-আরারাত এক কথায় আরারাত সন্নিহিত গোটা ইজডির প্রদেশের হাজার হাজার পরিবারের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র চলছে। হাজারো তরুণকে ড্রাগ ট্রেডার সাজিয়ে জেলে পুরা হয়েছে। শতশত পরিবার বিরান হয়ে গেছে অথবা এই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। এই ব্যাপারে এই পরিবার এবং এই এলাকার পক্ষ থেকে সরকারের আশু তদন্ত ও আইনি প্রতিকার চাওয়া হবে।' থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার এই কথাগুলো বিস্ময়কর কোন কাহিনী ডিজক্লোস করার মত সকলের মনে তড়িৎ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল।

ডিওপি খাল্লিকান খাচিপের চোখ-মুখ যেন অনেকটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। উদ্বেগের চিহ্নও আছে তার মধ্যে। আর থানা ইনচার্জ মোস্তফা ওকালানের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। অন্যদিকে ড. আজদার মামা ও ফুপাদের চোখে বিস্ময় ও কৌতুহল। কিন্তু অপার বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে ড. আজদা। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, তার, তার পরিবার ও তার অঞ্চলের একথাগুলো আবু আহমদ লোকটি জানল কি করে! শুধু জানা নয়, সে কথাগুলো মামলা দায়েরের ভাষায় এমনভাবে সাজিয়ে বলল, যা সে নিজেও কখনো কল্পনা করেনি। এ ধরনের কেস যে এই সময় করা যায়, সেটাও তার মাথায় নেই। কিন্তু লোকটির মাথায় এল কি করে! কে এই লোক? ড. আজদা আহমদ মুসাকে যতই দেখছে ততই যেন দেখার আগ্রহ বাড়ছে। কে এই বিস্ময়কর লোকটি?

ডিওপি খাচিপ দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছিল। বলল, 'আপনি এসব কি বলছেন? এ ধরনের অভিযোগ কখনও কেউ আমাদের কাছে করেনি।'

'এবার অভিযোগ পাবেন।' বলল আহমদ মুসা।

এবার হাসল ডিওপি খাচিপ। পুরোপুরিই নিজেকে সামলে নিয়েছে সে। বলল, 'ভালো! কেস দায়ের করুন। আপনার ভাষা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি তুর্কি নন। আপনি রিভলভারের লাইসেন্স কিভাবে পেয়েছেন আমি জানি না। আপনি কিভাবে এদেশে আছেন সেটাও জানি না। আমি দেখব এসব। কিন্তু বেশি ঝামেলা করলে আপনিও বিপদে পড়বেন।'

বলে উঠে দাঁড়াল ডিওপি খাল্লিকান খাচিপ। থানা ইনচার্জ মোস্তফা ওকালানকে বলল, 'চল, এখানকার কাজ শেষ।'

কথা শেষ করেই হাঁটতে শুরু করল খাচিপ।

থানা ইনচার্জ ওকালান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা শুনছিল। সেও যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবার সময় ড. আজদাকে বলল, 'আপনারা এখন আসতে পারেন।'

ড. আজদা তাকাল আহমদ মুসার দিকে সিদ্ধান্তের জন্যে।

'চলুন।' আহমদ মুসা বলল। আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল ড. আজদাও।

ড. আজদার মামা-ফুপারাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

'মামা, ফুপা-ফুপি, আপনারা এ দিকটা দেখুন। আমরা থানা থেকে আসছি।'

ড. আজদার মামা, ফুপুরা ড. আজদার কথায় সায় দিল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা ও ড. আজদারা পুলিশের সাথে।

নাস্তার পর একটু রেস্ট নিয়ে ফ্রেশ হয়ে আহমদ মুসা এল লাউঞ্জে।

ড. আজদা, তার মামা ও তার ফুপা-ফুপুরা আগেই এসে বসেছিল লাউঞ্জে।

কথা বলছিল তারা আহমদ মুসা মানে তাদের মেহমান আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে।

ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি ড. আজদাকে লক্ষ্য করে শুরুতেই বলেছিল, 'লোকটি আসলে কে আজদা? আমি আমার জীবনে এমন বিস্ময়কর মানুষ দেখিনি। শুধু অস্ত্রের যুদ্ধে অবিশ্বাস্যভাবে শত্রুকে পরাজিত করাই নয়, কথার যুদ্ধে প্রদেশের শীর্ষ পুলিশ অফিসারকে যেভাবে পরাজিত করেছে, আমাদের মামলার বিষয়টাকে সে যেভাবে সাজাল তা বিস্ময়কর। আগন্তুক বলে মনেই হলো না। যেন সেই এ বাড়ির কর্তা, সব জানে সে। এটা কি করে সম্ভব!'

কামাল বারকি থামতেই কথা বলে উঠেছিল ড. সাহাব নুরী। সে বলে, 'উনি না থাকলে আজ কি ঘটত, তা ভাবতেও বুক কাঁপছে। আর উনি বুদ্ধি দিয়ে পুলিশ অফিসারকে কোণঠাসা করতে না পারলে আজদাকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যেতে হতো এবং নানা নাজেহালের শিকার হতে হতো।'

ড. আজদা ভাবছিল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। এ ধরনের মানুষের কথা কল্পনাই করা যায়, বাস্তবে দেখবে, এমন আশাও কেউ করে না। কিন্তু আশাতীত ঘটনা, আর আশাতীত মানুষকেই সে দেখছে। সত্যি কে এই লোক? কোত্থেকে হঠাৎ তার বিপদের সময় হাজির হলো?

ড. সাহাব নুরীর কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর কথা বলেছিল ড. আজদা। বলেছিল সে, 'মামাজি, ফুপাজি, উনি কে আমিও জানি না এখনো। আসলেই উনি একজন বিস্ময়কর মানুষ। গত সন্ধ্যার সব কথা তো আপনাদের বলা হয়নি। উনি উপস্থিত না থাকলে, উনি ব্যাপারটাকে ট্যাকল না করলে আমাকে খুনের কেসে জড়াতে হতো। ইন্সপেক্টর রশিদ দারাগ সন্ত্রাসীদের পক্ষ হয়ে মিথ্যা কাহিনী তৈরি করেছিল, যাতে আমি খুনের আসামী হয়ে যাই। পুলিশের মিথ্যা কাহিনীর মোকাবিলায় আবু আহমদ আব্দুল্লাহ সাহেবও আমাকে বাঁচানোর জন্যে একটা কাহিনী তৈরি করেছিলেন এবং ইন্সপেক্টর রশিদ দারাগকে বলেছিলেন, যদি এ কাহিনী রশিদ দারাগ মেনে না নেয়, তাহলে পুলিশ রশিদ দারাগকে মেরে ফেলে প্রমাণ করবেন, সন্ত্রাসীদের গুলিতে ইন্সপেক্টর দারাগ নিহত হবার পর তিনি ঐ চারজন সন্ত্রাসীকে মেরেছেন রশিদ দারাগের রিভলভার দিয়ে। ইন্সপেক্টর রশিদ দারাগ আবু আহমদ সাহেবকে গুলি করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই

আবু আহমদ আব্দুল্লাহ পুলিশ অফিসারের কাঁধে গুলি করে এবং বলে যে, আমি আপনাকে বুকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু মারিনি। আশা করি সত্যটা মেনে নেবেন। না হলে মারার সিদ্ধান্ত এখনও নিতে পারি। বলে রিভলভার তুলেছিল পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে। অবাক ব্যাপার, হঠাৎ যেন পুলিশ অফিসার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে! তখন কি ভেবে পুলিশ অফিসার আমাদের সহযোগিতা করেন। সেজন্যে আমি বেঁচে যাই।'

ড. আজদার মামা ও ফুপা-ফুপিরা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল ড. আজদার কাহিনী শুনে। ভাবছিল, লোকটি কি অদ্ভুত! তার কি কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে? মামা ড. সাহাব নুরী বলেছিল অবশেষে, 'পুলিশ অফিসার খাল্লিকান খাচিপকে আবু আহমদ সাহেব তার রিভলভারের যে লাইসেন্স দেখিয়েছিলেন, তা ইস্যু হয়েছে স্টেট সিকিউরিটির হেড অফিস থেকে। হেড অফিস থেকে এ ধরনের যে লাইসেন্স ইস্যু হয়, তা বিশেষ ধরনের এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে ইস্যু করা হয়। কিন্তু এই আবু আহমদ কে যে, তার জন্যে এটা করা হলো!'

কিছু বলতে যাচ্ছিল ড. আজদা। দেখতে পেল, আবু আহমদ আব্দুল্লাহ লাউঞ্জে প্রবেশ করছে। থেমে গেল ড. আজদা। উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে। সামনে সোফা দেখিয়ে বলল, 'বসুন স্যার। আমরা আপনার অপেক্ষা করছি।'

সবাইকে সালাম দিয়ে সোফায় বসল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বসতেই ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'আমরা কৃতজ্ঞ জনাব আবু আব্দুল্লাহ। আমাদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আজদাকে আজ যে দেখা যাচ্ছে, সেটা আপনার কারণেই।'

'এটা কি আমাকে বিদায় দেয়ার অনুষ্ঠান? বিদায় দেয়ার সময় এভাবে মানুষ কৃতজ্ঞতা জানায়।' বলল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি।

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই ড. আজদা ছুটে গিয়ে দু'হাত জোড় করে আহমদ মুসার পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর বসল। বলল, 'আমাদের

ভুল বুঝবেন না স্যার। আমাদের কথার অর্থ ওটা নয়, প্লিজ। আমার এবং আমার পরিবারের যিনি ত্রাতা, তার সম্পর্কে কি কেউ এমন করে ভাবতে পারে?'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'স্যরি ড. আজদা। আমার কথাটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছেন আপনি। আমি একটু রসিকতা করছিলাম।'

ড. আজদা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'স্যার, রসিকতা যেটা বলেছেন, সেটার ভারও বহন করার সাধ্য আমাদের হৃদয়ে নেই।'

'স্যরি ড. আজদা।' বলল আহমদ মুসা।

'মাফ করবেন স্যার।' বলে ড. আজদা উঠে গিয়ে তার আসনে বসল।

আহমদ মুসা ড. আজদার ফুপা কামাল বারকিকে লক্ষ্য করে বলল, 'জনাব, কৃতজ্ঞতা আমাকে নয়, কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার আল্লাহকে। আমি আপনাদের এই আরিয়াসকে চিনি না, এখানে আমার স্বজনও নেই, এখানে আমার নিজের কোন প্রয়োজনও ছিল না, তাহলে আমি এখানে এলাম কেন? কিভাবে এলাম? এর জবাব আমার কাছে একটাই, সেটা হলো, আল্লাহ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। তারপর গত সন্ধ্যা থেকে আজ পর্যন্ত এখানে যা ঘটল, তা আমার কোন পরিকল্পনার অংশ নয়। গত সন্ধ্যা এবং রাতের দু'ঘটনায় আমি যা করেছি, তা আমার ইচ্ছায় হয়নি। আমাকে দিয়ে তা করানো হয়েছে। করিয়েছেন আল্লাহ। আমি মহান আল্লাহর একটা হাতিয়ার মাত্র। সুতরাং কৃতজ্ঞতা আপনাদের মহান আল্লাহকেই জানানো দরকার। তিনিই আমাকে এনেছেন, আমাকে দিয়ে এসব করিয়ে নেয়ার জন্যেই। তিনিই আপনাদেরকে আমার নতুন স্বজন বানিয়েছেন। হৃদয়ের সব কৃতজ্ঞতা তার দিকেই ধাবিত হওয়া দরকার।' থামল আহমদ মুসা।

কারও কাছ থেকে কোন কথা এল না।

ড. আজদা, তার মামা ড. সাহাব নুরী, তার ফুপা কামাল বারকি এবং ফুপি লায়লা কামাল সবাই নীরব। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময় ও আবেগের একটা স্ফূরণ। হঠাৎ করেই তাদের মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টি যেন গলিত মোমের মত অনেকটা নরম হয়ে গেছে। কারও কারও চোখে সেই দৃষ্টিতে একটা অপ্রস্তুতের ভাবও।

আহমদ মুসার কথাগুলোতেও একটা আবেগ ছিল। কথার শেষের দিকে তার কণ্ঠও ভারি হয়ে উঠেছিল।

অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙল ড. আজদার ফুপি লায়লা কামাল।

লায়লা কামালের বয়স ষাটোর্ধ্ব হবে। এই বয়সেও তার মেদহীন একহারা চেহারা। বোঝাই যায়, নিয়মিত উনি ব্যায়াম করেন এবং সম্ভবত ডায়েট কন্ট্রোলও করেন। চোখে তার দামী চশমা। নিয়মিত প্রসাধন ব্যবহার করেন, মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়। পরনে আধুনিক পোশাক। ড. আজদার পরনে সালোয়ার কামিজসহ মাথায়-বুকে ওড়না থাকলেও মিসেস লায়লা পরেছেন ট্রাউজার ও শার্ট।

লায়লা কামালই নীরবতা ভাঙল। বলল, 'বেটা, তুমি আমাদের স্বজন বলেছ, আমরা তোমাকে পর ভাবতে পারি না। তুমি শুধু অসম সাহসী এবং সব দিক থেকে যোগ্যতাসম্পন্নই নও, বেটা তুমি খুব ভালো ছেলেও। কিন্তু বেটা, তুমি যাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে বলেছ, তিনি তো আমাদের জীবনে নেই। আজদার বাবা মা'র মত আমরাও কমিউনিস্ট পার্টি করতাম। কমিউনিস্ট পার্টি এখন আমরা ঐভাবে না করলেও সেই আদর্শে বিশ্বাস করি। যে নেই, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাব কি করে?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'স্রষ্টা আপনার, বা আপনাদের জীবনে নেই বলেছেন। কিন্তু কোথাও নেই-এ কথা বলেননি। আসলে স্রষ্টা আছেন।'

'আছেন স্রষ্টা, এ কথা আপনি বলছেন কি করে?'

'আমি বলছি না, মানুষ, মানুষের ইতিহাস এ কথা বলছে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিভাবে?' জিজ্ঞাসা ড. আজদার ফুপি লায়লা কামালের।

'মানুষের জীবনের শুরু আছে এবং শেষও আছে। তাই মানুষ সৃষ্ট। সৃষ্ট বলে তার স্রষ্টাও আছে। আর একটা কথা, মানুষও তার জন্যে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস সৃষ্টি করে। এগুলোর মধ্যে কোনটিই মানুষের জন্যে আপনা-আপনি সৃষ্টি হচ্ছে না।' আহমদ মুসা বলল।

'মানুষ যেসব জিনিস তৈরি করে, সেক্ষেত্রে না হোক, প্রাকৃতিক জগতে তো সবকিছুই আপনা-আপনি সৃষ্টি হচ্ছে, কাউকেই তো সৃষ্টি করতে দেখা যাচ্ছে না।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট সব জীবন ও বস্তুর মধ্যে সৃষ্টিগত ঐকতান আছে। এক আইন, একই দর্শন রয়েছে সব সৃষ্ট বস্তু ও জীব-জীবনের মূলে। এর অর্থ, এসব কোন কিছুই আপনা-আপনি সৃষ্টি নয়, একক এক স্রষ্টার সজ্ঞান পরিকল্পনা ও আইন কাজ করছে সৃষ্টি জগতের মূলে। আপনা-আপনি সৃষ্টি হলে সব বস্তু ও জীবের সৃষ্টিগত দর্শন ও আইন এক রকম হতো না। হতো ভিন্ন ভিন্ন।' আহমদ মুসা থামল।

কিন্তু অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না লায়লা কামাল। গভীর একটা ভাবনার প্রকাশ তার চোখে-মুখে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'কিন্তু স্রষ্টা নিজেকে আড়ালে রাখার কারণ কি? বিভ্রান্তি তো এখানেই।'

'স্রষ্টা নিজেকে আড়ালে রাখেননি। আমরা তাঁকে দেখতে পাই না মাত্র। এটা আমাদের সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা। যেমন, আপনি আপনার প্রয়োজনে রোবট তৈরি করলেন। রোবটটি আপনি যেমন চান সেভাবে কাজ করবে। কিন্তু তার চোখ আপনাকে দেখবে না, জানবে না এবং বুঝবে না যে, কে তার স্রষ্টা। এটা রোবটের সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা।' আহমদ মুসা বলল।

সূক্ষ্ম এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে লায়লা কামালের মুখে। বলল, 'আমরা রোবটকে বানাই নির্দিষ্ট কাজের জন্যে। কিন্তু আমাদের কাছে স্রষ্টা কি চান?'

'রোবটের স্রষ্টা হিসেবে মানুষ এবং মানুষের 'স্রষ্টা'র মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মানুষ রোবট সৃষ্টি করে তার প্রয়োজনে কিছু নির্দিষ্ট কাজ করার জন্যে। কিন্তু মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ অভাবশূন্য, প্রয়োজনশূন্য। তিনি কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। মানুষের কোন কাজের দ্বারা উপকৃত হবার জন্যে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেননি। বরং বিশ্বজগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্যে। সূর্যের আলো মানুষ ও জীবজগতের জন্যে প্রয়োজন। সূর্য ও পৃথিবীর পারস্পরিক আকর্ষণের ভারসাম্য পৃথিবীর কক্ষপথের স্থিতির জন্যে

অপরিহার্য। চাঁদের আলো মানুষ, জীব ও উদ্ভিজ্জের জন্যে দরকারী। এইভাবে পৃথিবীর আলো, বাতাস, জীব-উদ্ভিজ্জ, পাহাড়, নদী, সমুদ্র সবকিছুই মানুষকে তার জীবনধারণে সাহায্য করছে। রোবটের স্রষ্টা মানুষ এবং মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর মধ্যে এটাই পার্থক্য। মানুষ স্বার্থপর, তাই তার সৃষ্ট রোবটের কাছ থেকে স্বার্থ আদায় করে, কিন্তু মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ মানুষের কাছে কোন উপকার চান না, নেন না। আর সে প্রয়োজনও মানুষের স্রষ্টার নেই।'

ড. আজদা, তার মামা ড. সাহাব নুরী এবং ফুপা কামাল বারকি আহমদ মুসার কথাগুলো যেন গোগ্রাসে গিলছে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়-বিমুগ্ধতা।

আর ড. আজদার ফুপি লায়লা কামালের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা থামতেই সে বলে উঠল, 'তাহলে স্রষ্টা কষ্ট করে মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি? কোন কাজে না লাগলে, কোন স্বার্থ পূরণ না হলে তিনি মানুষ সৃষ্টি করবেন কেন? করেছেন কেন?'

'ধন্যবাদ। আপনার এ প্রশ্নটি চিরন্তনী একটা প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ আল-কুরআনের বহু জায়গায় অনেকভাবে দিয়েছেন। তার একটি হলো: তিনি বলেছেন, 'আমি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছি দেখার জন্যে যে, কে ভালো কাজ করে।' অর্থাৎ আল্লাহ চান যে, মানুষ মন্দ কাজ না করে ভালো কাজ করুক। মানুষ কি করে এটাই তিনি দেখতে চান। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁর এটাই।'

ড. আজদার ফুপু লায়লা কামালের মুখে সূক্ষ্ম এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'অর্থাৎ তিনি মানুষকে পরীক্ষা করতে চান। তোমার কথায়, তিনি চান মানুষ ভালো কাজ করুক। তুমি নিশ্চয় আরও বলবে যে, ধর্ম মানে আল-কুরআন যে ভালো কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে, তা-ই। আর মানুষকে সে কাজ করতে হবে। কুরআন তো মুসলমানদের। কিন্তু আমরা আলোচনা করছি গোটা মানবজাতি নিয়ে। ভালো কাজের পরীক্ষা আল্লাহ তাদের কাছ থেকে কিভাবে নেবেন, যারা কুরআন দেখেনি বা চেনে না কিংবা একে গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি? স্রষ্টার পক্ষের 'পরীক্ষা'র যে ইউনিভার্সেল তত্ত্বের কথা তুমি বললে, তার

মধ্যে তো এরা পড়ে না। যাদের পরীক্ষা করা হবে, তারা তো পরীক্ষার বিষয় মানে কোনটাকে 'ভালো' বলা হয়েছে, আর 'মন্দ'ই বা কি কি, তা তাদের জানা দরকার।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'এ প্রশ্ন বা এ অজুহাত যাতে কোন মানুষের পক্ষ থেকেই উঠতে না পারে, তার জন্যে ব্যবস্থা কিন্তু স্রষ্টা আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথেই করে দিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আল্লাহ স্বভাবজাত একটা সাধারণ নীতিবোধ দিয়েছেন, সে নীতিবোধ থেকে সভ্যতা বা লোকালয় থেকে অনেক দূরে গহীন কোন জংগলে জন্মগ্রহণকারী এবং জঙ্গলেই বেড়ে উঠা একজন মানুষও বলতে পারে, মানুষকে 'সাহায্য করা' ভালো কাজ, 'চুরি করা' মন্দ কাজ। বলতে পারে, মানুষকে 'ভালোবাসা' ভালো কাজ, 'গালি দেয়া' মন্দ কাজ। বলতে পারে, পিতা-মাতাকে 'মান্য করা, সম্মান করা' ভালো কাজ, 'অবাধ্য হওয়া' মন্দ কাজ। বলতে পারে, একজন পথহারাকে 'পথ দেখানো' ভালো কাজ, তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তার 'ক্ষতি করা' মন্দ কাজ। এভাবে মানুষের মধ্যে স্রষ্টার দেয়া 'নীতিবোধ' থেকে মানুষের মধ্যে স্বভাবজাতভাবেই 'ভালো' ও 'মন্দ'-এর দীর্ঘ তালিকা তৈরি হয়ে থাকে। এর ভিত্তিতেও স্রষ্টা আল্লাহ মানুষের পরীক্ষা নেবেন যে, মানুষ মন্দ হতে দূরে থেকে কতটা ভালো কাজ করে।' থামল আহমদ মুসা।

ড. আজদার ফুপি লায়লা কামালের চোখে-মুখে একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠেছে। তার চোখের একটা মুগ্ধ দৃষ্টিও আহমদ মুসার প্রতি নিবদ্ধ। কিন্তু পরক্ষণেই তার ঠোঁটে একটা রহস্যপূর্ণ হাসি দেখা গেল। বলল সে, 'ধন্যবাদ বেটা! তুমি একটা কঠিন প্রশ্নের একটা সুন্দর ও সহজ উত্তর দিয়েছ। কিন্তু উত্তর হিসেবে যে বিষয়টা বলেছ, তা অত্যন্ত ভারি। এর মধ্য দিয়ে একটা চিরন্তন দর্শন সামনে এসেছে। কিন্তু বেটা, এ দর্শন প্রমাণ করছে, 'ভালো' বা 'মন্দ' বেছে নেয়ার দায়িত্ব মানুষের স্বভাবজাত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাহলে নবী-রাসূল ও ধর্মগ্রন্থের কোন প্রয়োজন নেই। তুমি কিন্তু তোমার নিজের ফাঁদেই নিজে পড়ে গেছ বেটা।' বলেই হেসে উঠল লায়লা কামাল।

একটু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল আহমদ মুসা। বলল, 'ভালো ও মন্দ বেছে নেয়ার ক্ষমতা মানুষের স্বভাবজাত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও নবী-রাসূল অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েন না। এর সহজ একটা দৃষ্টান্ত হলো, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক সব দিক দিয়েই প্রতিটি মানুষ তাত্ত্বিকভাবে স্বশাসিত হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে সমাজ শৃঙ্খলা, সমাজ পরিচালনা, জাতি ও দেশের সামষ্টিক রক্ষার প্রয়োজনে সরকার ও শাসকের প্রয়োজন। কারণ, সমাজ ও জাতি দেহে বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং তার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে ধ্বংস ডেকে আনার শক্তি সমাজে প্রবল। সরকার ও শাসক এই শক্তির প্রতিরোধ করে। অনুরূপভাবে, মানুষের 'নীতিবোধ'-এর বিপরীতে মানুষের মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি প্রবণতার প্রবল শক্তি। প্রতিটি মানুষের এই 'নীতিবোধ' ও তার দুর্নীতি প্রবণতার মধ্যে বিরামহীন সংগ্রাম চলছে। যেহেতু 'নীতিবোধ'-এর চাইতে 'দুর্নীতি প্রবণতা'র মধ্যে মানুষের লাভ ও লোভ-লিপ্সা চরিতার্থের সীমাহীন সুযোগ রয়েছে, তাই দুর্নীতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশি হয়। ফলে মানুষকে যে পরীক্ষার জন্যে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, সে পরীক্ষায় অধিকাংশের ফেইল করার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। এ কথা যে ঠিক, মানুষের ইতিহাস তার সাক্ষী। স্রষ্টার পরীক্ষায় মানুষের ফেইল করার অর্থ, দুনিয়ার জীবনে অশান্তি, বিপর্যয় এবং আখেরাতের জীবনে এর পরিণতি হিসেবে সীমাহীন শাস্তি। মানুষ এই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের পথে যাতে না যায়, এজন্যে দয়াময় আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে মানুষকে সাহায্য করার জন্যে যুগে যুগে নবী–রাসূল পাঠান সতর্ককারী হিসেবে, 'নীতিবোধ'-এর প্রতি আহ্বানকারী হিসেবে। তাদের মাধ্যমে পাঠানো হয়, 'ভালো'র দিকে আহ্বান ও 'মন্দ'র প্রতি নিষেধের সুস্পষ্ট নীতিমালা, যাকে প্রচলিত ভাষায় আমরা বলি ধর্মগ্রন্থ, যেমন আল-কুরআন। সুতরাং মানুষের স্বভাবজাত নীতিবোধ যতটা জরুরি, ততটাই জরুরি নবী-রাসূলদের আগমন ও ধর্মগ্রন্থের উপস্থিতি। মানুষর স্বভাবজাত নীতিবোধের সাথে তার স্বভাবজাত (শয়তান পরিচালিত) দুর্নীতি প্রবণতার চিরন্তন লড়াইয়ে মানুষের বিজয় অর্জনের হাতিয়ারই হলো নবী-রাসূল এবং তাদের মাধ্যমে আসা ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং, নবী-রাসূল ও তাদের মাধ্যমে আসা ধর্মগ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় নয়, বরং দুর্নীতিজাত ইহকালীন ধ্বংস-বিপর্যয় ও

পরকালীন সীমাহীন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে, স্বভাবজাত নীতিবোধকে বিজয়ী করার জন্যে এবং স্রষ্টার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে নবী-রাসূল ও তাদের মাধ্যমে আসা ধর্মগ্রন্থ মানুষের জন্যে অপরিহার্য।'

হাসি ও বিস্ময়-বিমুগ্ধতায় ভরে গিয়েছিল লায়লা কামালের চোখ-মুখ।

ড. আজদা ও তার মামা ড. সাহাব নুরী ও ফুপা কামাল বারকির চোখে-মুখেও অপার বিস্ময়-বিমুগ্ধতা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই লায়লা কামাল উঠে দাঁড়াল। কোমর বাঁকিয়ে মাথা নুইয়ে আহমদ মুসাকে ইউরোপীয় ঢংয়ে বাউ করে বলল, 'বেটা, তুমি আমার সন্তানতুল্য। কিন্তু তুমি কাজ করেছ আমার গুরুর মতো। এভাবে 'বাউ' করা ছাড়া তোমাকে শ্রদ্ধা জানানোর এই মুহূর্তে আর কিছু আমি পেলাম না। তুমি আমার হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা গ্রহণ করো বাছা। আমি তোমার প্রতিটি কথা গ্রহণ করলাম। সেই সাথে মাফ চাইছি আমি স্রষ্টা আল্লাহর কাছে। আমি তাঁকে, তাঁর রাসূল(সাঃ)-কে, তাঁর বাণী(কুরআন)-কে চিনতে পেরেছি।' লায়লা কামালের শেষ কথাগুলো আবেগ-ভরা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বসে পড়ল লায়লা কামাল।

'উনি যা বলেছেন, সেটা আমারও কথা। বিস্ময়কর আপনি! অল্প কথায় অদ্ভুতভাবে আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। ভাবনার এদিকটা কোনদিন কল্পনাও করিনি। আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।' প্রায় একসাথেই বলে উঠল ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি ও মামা ড. সাহাব নুরী।

অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল ড. আজদার দু'চোখ থেকে। তার আনন্দ যে, তার পরিবারে যে পরিবর্তন সে চাচ্ছিল, সে পরিবর্তন যেন আকস্মিকভাবেই ঘটে গেল। আজ যদি তার আব্বা-আম্মা এখানে উপস্থিত থাকতেন! আহমদ মুসার প্রতি শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ল তার সমগ্র হৃদয়। অপরূপ এই মানুষ! বন্দুক হাতে যেমন অতুলনীয়, শান্তির বার্তাতেও তেমনি অভাবনীয় এক কুশলী মানুষ। আল্লাহর প্রতি সেজদায় অবনত হতে চাইল তার মাথা। আল্লাহ কোত্থেকে আনলেন অপরূপ সুন্দর, অসীম সাহসী, অকল্পনীয় কুশলী এই মানুষটিকে!

গম্ভীর হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার মুখ। ড. সাহাব নুরী ও কামাল বারকির কথা শেষ হলে আহমদ মুসা বলল, 'আমি আবারও বলছি, আপনার সব কৃতজ্ঞতা, সব প্রশংসা আল্লাহর প্রতি হওয়া উচিত। তাঁর এবং রাসূল(সাঃ) –এর শেখানো কথারই কয়েকটা বলেছি মাত্র। মহান আল্লাহ আপনাদের কবুল করুন।'

বলেই আহমদ মুসা তাকাল ড. আজদার দিকে। বলল, 'আপনার চোখের অশ্রু মুছে ফেলুন ড. আজদা। আপনি কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে। আপনার চোখে থাকতে হবে অশ্রুর বদলে সংগ্রাম ও শক্তির আগুন।'

'জনাব, এ অশ্রু আনন্দের, যা পাওয়ার কথা কল্পনা করতে পারিনি তা পাওয়ার এই অশ্রু। আপনি শুধু আমার জীবন বাঁচিয়েছেন তা-ই নয়, আমার পরিবারকেও আপনি নতুন জীবন দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ।' বলল ড. আজদা।

ড. আজদা থামতেই তার ফুপু লায়লা কামাল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলব বেটা।'

'বলুন'। বলল আহমদ মুসা।

'তোমার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না বাছা। খুব জানতে ইচ্ছে করছে তোমার পরিচয়। তুমি আমাদেরকে বিমুগ্ধ, বিস্মিত ও চমৎকৃত করেছ।'

'আমার সম্পর্কে কি বলব! আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। মদিনা শরীফে আমার একটা ঠিকানা আছে। সেখানে আমার স্ত্রী ও একটি ছেলে আছে। স্ত্রী ও ছেলে নিয়ে আমি ইস্তাম্বুলে গিয়েছিলাম একটা কাজে। কাজ শেষে ইস্তাম্বুল থেকে আংকারা হয়ে এখানে এসেছি। তুরস্কের একটা বিশেষ বিমান ভ্যান এয়ারপোর্টে আমাকে নামিয়ে দিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে মদিনা শরীফে গেছে। আমি এসে...।'

আহমদ মুসার কথার মধ্যেই কামাল বারকি বলে উঠল, 'কিন্তু বিশেষ বিমান কিভাবে পেলেন? কে দিল?'

আহমদ মুসা একটু বিব্রত হলো। কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেছে। একটু ভাবল আহমদ মুসা। মিথ্যা বলে কি লাভ! বলল সে, 'আপনাদের প্রেসিডেন্টের নির্দেশে বিমানটি পেয়েছিলাম।'

কামাল বারকি, ড. সাহাব নুরী, লায়লা কামাল, ড. আজদা সবাই চমকে উঠে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তাদের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত, আমাদের প্রেসিডেন্ট তাকে বিশেষ বিমান দিয়েছেন! বলল লায়লা কামাল, 'বুঝতে পারছি না, প্রেসিডেন্ট বিশেষ বিমান কেন দিলেন তোমাকে? কে তাহলে তুমি, সেটাই আমাদের প্রশ্ন।'

'আমার অনুরোধ আপনাদের সবাইকে, এ ধরনের কোন প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না এখন। আমি যাবার সময় সব প্রশ্নের উত্তর আপনাদের দিয়ে যাব। প্লিজ, আমাকে আপনারা সহযোগিতা করুন।'

বলে আহমদ মুসা একটু থেমেই আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল। কামাল বারকি বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যা ভালো মনে করেন, সেটাই হবে। আপনি যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন, বলুন।'

কামাল বারকির কথা শেষ হতেই ড. আজদা বলে উঠল, 'অন্য সব কথা থাক, একটা বিষয় তো বলা যায়। স্যার, আপনি ভ্যান বিমানবন্দরে নামলেন কেন? কেনই বা অখ্যাত আরিয়াসে এলেন? আর এসেই জড়িয়ে পড়লেন আমাদের ঘটনায়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, দেখা যাচ্ছে, আপনি এখানকার ভেতরের পরিস্থিতির অনেক কিছুই জানেন। গোটা বিষয় কি কাকতালীয়, না এর কোন ব্যাখ্যা আছে?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, আমি এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।'

এইটুকু বলে একটু থামল আহমদ মুসা। একটা গাম্ভীর্য তার চোখে-মুখে। বলল, ধীর কণ্ঠে, 'ড. আজদা আয়েশা, আমি আপনার আহ্বানেই এখানে এসেছি। আপনার...।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী বলল, 'আজদার আহ্বানে!'

অন্য সবার চোখে-মুখেও বিস্ময়।

বিস্ময়ে 'হাঁ' হয়ে গেল আজদার মুখ। বলল সে, 'স্যার, আমার আহ্বানে আপনি এসেছেন! কিন্তু গতকাল সন্ধ্যার আগে তো আমি আপনাকে চিনতাম না! আর কোন আহ্বানই তো আমি কাউকে জানাইনি!'

আহমদ মুসা হাসল। জ্যাকেটের পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজ ড. আজদার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে ড. আজদা হাত বাড়িয়ে কাগজটি নিল। খুলল কাগজের ভাঁজ। শুরু করল পড়া।

কয়েক লাইন পড়েই চোখ তুলল ড. আজদা আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'স্যার, আমার ওয়েবসাইটে দেয়া আমার একটা আপীল এটা। আমার ওয়েবসাইটে পেয়েছেন?'

'আমি ওয়েবসাইট দেখিনি। আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী মহিলা আমার স্ত্রীর মাধ্যমে এ মেসেজটি আমার কাছে পাঠান বিষয়টিকে আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করব এই ভেবে। সত্যিই বিষয়টি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।' বলল আহমদ মুসা।

মুখ নিচু করেছিল ড. আজদা আয়েশা। আহমদ মুসার কথা শেষ হলে মুখ তুলল সে। তার দু'চোখ অশ্রুতে ভরা। বলল, 'আল্লাহর হাজার শোকর। অসীম দয়ালু তিনি। আমি মনে করছি, আমার আপীল তিনি সবচেয়ে উপযুক্ত হাতে পৌঁছিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।'

বলে ড. আজদা তাকাল ফুপির দিকে। বলল, 'ফুপু, আল্লাহ আছেন। তিনি কত কাছে আছেন, কত দ্রুত তিনি মানুষের আপীল শুনেন, এই আপীলের সাফল্যই তার প্রমাণ।'

বলে হাতের কাগজটি তুলে দিল ফুপুর হাতে। বলল, 'এই আবেদন আমি আমার ওয়েবসাইটে দিয়েছিলাম এই বিশ্বাসে যে, আল্লাহ আমার এই আপীল দেখবেন এবং এই আপীল তিনি তার মনোনীত কাউকে দেবেন যাতে তিনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন।'

ড. আজদার ফুপু লায়লা কামাল আজদার দেয়া মেসেজটি পড়ল এবং মেসেজটি সে তার স্বামী কামাল বারকির হাতে দিল। কামাল বারকি এবং ড. সাহাব নুরী দু'জনেই একে একে মেসেজটি পড়ল।

ড. সাহাব নুরী মেসেজটি পড়া শেষ করে মুখ তুলে সবার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'যেমন অদ্ভুত মেসেজটি পাঠানো, তেমনি অদ্ভুত মেসেজ পেয়ে জনাব আবু আহমদ আব্দুল্লাহর চলে আসা।'

'গোটা ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। তবে গায়েবের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ এবং গায়েবের প্রতি বিশ্বাসের চেয়ে এটা ছোট বিষয়। সুতরাং আবু আহমদ বলার পর ঘটনার মধ্যে অবিশ্বাস বা বিস্ময়ের কিছু নেই। আর একটি কথা, রূপকথার মত বন্দী রাজকুমারীর আহ্বানে হাতি-ঘোড়া, লোক-লস্কর ছাড়া রাজকুমার আবু আহমদের এই আগমন আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হতো আমি আগের অবস্থায় থাকলে, কিন্তু আবু আহমদের যে চৌকস পরিচয় ইতোমধ্যেই পেয়েছি, তাতে বিস্ময় বা অবিশ্বাসের কোন অবকাশ নেই।'

একটু থামল লায়লা কামাল। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'বেটা আবু আহমদ আব্দুল্লাহ, তোমার কাছে আমার জিজ্ঞাসা, আমার ভয় করছে, আজদাকে সাহায্য করার জন্যে এখানে আসার আগে তোমার যে ইচ্ছা, যে সিদ্ধান্ত ছিল, গত সন্ধ্যা থেকে আজ পর্যন্ত যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটল, তাতে তোমার সেই ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত ঠিক আছে কিনা? বিপদ সম্পর্কে আমাদেরও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, কিন্তু ভয়াবহ সব ঘটনা দেখে বুঝতে পারছি, বিপদটা খুবই বড়, এদের মোকাবিলা বিপজ্জনক হবে। বেটা আবু আহমদ, তুমি কি ভাবছ এ ব্যাপারে? আমরা কি বিপদ থেকে উদ্ধার পাব?'

গম্ভীর হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। বলল, 'বিপদ থেকে ড. আজদা ও আরিয়াসের মানুষ উদ্ধার পাবে কিনা, এটা আল্লাহ বলতে পারেন। এখানে আসার আগেই বিপদের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমার উপলব্ধি ছিল। আমি জেনে বুঝেই এসেছি এবং আল্লাহ সহায় হলে বিপদের মূলোচ্ছেদ ঘটার পরই আমি যাব।'

'আলহামদুলিল্লাহ!' ড. আজদারা সবাই সমস্বরে বলে উঠল।

'স্যরি জনাব আবু আহমদ, আজদার মেসেজে তো বিপদের পরিচয় ও ভয়াবহতা সম্পর্কে কোন কথা নেই। এখানে আসার আগে তাহলে বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি আপনার কিভাবে হয়েছিল?' বলল ড. সাহাব নুরী।

‘গত কয়েক বছর আগে আমাকে আর্মেনিয়ায় আসতে হয়েছিল আরেকটা কাজে। সে সময় আর্মেনিয়ায় বিপজ্জনক একটা গ্রুপের সন্ধান পেয়েছিলাম। আমি অনেকটাই নিশ্চিত, সে গ্রুপটিই আরিয়াস-আরারাত অঞ্চলের বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের সাথে জড়িত।’ আহমদ মুসা বলল।

আর্মেনিয়ার নাম শুনে সবাই যেন নড়েচড়ে বসল। তাদের চোখে দুর্ভাবনার চিহ্ন। কথা বলল কামাল বারকি। বলল সে, ‘এ বিষয়টার সাথে আর্মেনিয়া জড়িত? রাজনীতিরও কি যোগ আছে বিষয়টার সাথে?’

‘এর কোন সঠিক জবাব আমার কাছে নেই। আরও জানতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘অবশ্যই। যাই হোক, ভয় কিন্তু আমাদের বেড়ে গেল। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।’ বলল ড. সাহাব নুরী।

ড. সাহাব নুরী থামলেও সংগে সংগে কেউ কথা বলল না। সবাই যেন ভাবছে।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

নীরবতা ভাঙল ড. আজদা। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘স্যার, আমরা তো মামলা করে এলাম। সরকারও একটা মামলা সাজাবে। এখন কি ঘটবে? আমাদের কি করণীয়?’

‘ধন্যবাদ ড. আজদা, এ বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার এখন। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আপনাদের নিরাপত্তা। ওরা পরাজয় মেনে নেয়নি। প্রথম আক্রমণে ব্যর্থতার পরপরই দ্বিতীয় আক্রমণ করেছে। দ্বিতীয় ব্যর্থতার পর অবশ্যই তারা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়েছে। আক্রমণের যে কোন সুযোগ তারা কাজে লাগাবে, রাত বা দিন যখনই হোক।’ আহমদ মুসা বলল।

ভয়-উদ্বেগে ছেয়ে গেল ড. আজদাদের মুখ। কামাল বারকি বলল, ‘আপনার কথা ঠিক। কিন্তু এখন কি করণীয়? আমরা কি পুলিশ প্রটেকশন চাইব?’

‘তা চাওয়া যায়, এটাই সবচেয়ে সহজ পথ। কিন্তু কতটা ফলপ্রসূ হবে, সেটাই প্রশ্ন। ইজডির প্রদেশের পুলিশ প্রধান খাল্লিকান খাচিপকে যেমনটা দেখা গেল, তা আশাব্যাঞ্জক নয়। গত সন্ধ্যায় খাল্লিকানের ডেপুটি রশিদ দারাগকেও

প্রথমে হোস্টাইল দেখা গেছে। পরে অনেকটা বাধ্য হয়েই তিনি আমাদের সহযোগিতা করেছেন। এখানকার পুলিশ স্টেশনের মোস্তফা ওকালানকে পরিষ্কার বোঝা যায়নি। আমার মনে হয়, ইজডির অঞ্চলের পুলিশ মাদকের ভয়াবহ বিস্তার নিয়ে খুব উত্তেজিত অবস্থায় আছে। মাদকের সাথে যাকে কিংবা যে পরিবারকেই যুক্ত দেখছে, তাদের বিরুদ্ধে তারা খড়্গহস্ত হচ্ছে। ড. আজদার পরিবার সম্পর্কেও তারা খারাপ ধারণা নিয়ে বসে আছে। সুতরাং পুলিশের আন্তরিক কো-অপারেশন কতটা পাওয়া যাবে, ঠিক বলা যাবে না।'

'তাহলে?' প্রশ্ন ড. আজদার। তার মুখে এক অসহায় ভাব।

''ভ্যান' শহরে আমাদের একটা বাড়ি আছে, 'কারস' শহরেও আরেকটা বাড়ি আছে। আজদা মাকে আমরা সেখানে পাঠিয়ে দেব, না তাকে তার বাবা-মা'র কাছে মস্কোতে পাঠিয়ে দেব? গতকাল তার বাবা-মা টেলিফোন করেছিল। ওরা আসছেন। তারা চাচ্ছে, ড. আজদা মস্কোতে তাদের সাথে যাক। ওরা এলে আতা সালাহ উদ্দিনের ব্যাপারে আপীল করার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা চূড়ান্ত হবে।' বলল ড. আজদার ফুপু লায়লা কামাল।

লায়লা কামালের কথা শেষ হতেই ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী বলল, 'আমার সাথেও কিছুক্ষণ আগে আপা-দুলাভাইয়ের কথা হয়েছে। আতা সালাহ উদ্দিনের এ দুর্ঘটনার পর বিশেষ করে গত সন্ধ্যা ও আজ রাতের ঘটনা শোনার পর ওরা বলছেন আজদাকে অবিলম্বে মস্কো পাঠিয়ে দিতে, অথবা মস্কো যেতে না চাইলে তাকে জার্মানি পাঠিয়ে দিতে।'

'এসব আপনাদের ব্যাপার, আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তা এই মুহূর্ত থেকেই করা দরকার।' বলল আহমদ মুসা।

'আমি মস্কো কিংবা জার্মানি কোথাও যাব না। আর পুলিশ কেসের জন্যে যে কোন সময় আমার প্রয়োজন হবে। আমি আমাদের ইজডির এলাকার বাইরে যেতে পারবো না।' ড. আজদা বলল।

'তাহলে তো অন্য সব চিন্তা করে লাভ নেই। নিরাপত্তা-ব্যবস্থা নিয়েই ভাবতে হবে এখন।' বলল কামাল বারকি।

‘বেটা আবু আহমদ, আমি একটা অনুরোধ করব?’ ড. আজদার ফুপু লায়লা কামাল বলল।

‘অনুরোধ নয়, বলুন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমাদের আজদাকে এখানে থাকতেই হচ্ছে। বাড়ি পাহারার জন্যে পুলিশকে আমরা হায়ার করব। কিন্তু বাছা, তোমাকেও থাকতে হবে এ বাড়িতে। তাছাড়া তুমি আজদার মেহমানও। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যতদিন সংকট দূর না হয়, ততদিন আজদার সাথে আমি এখানে থাকব।’ বলল লায়লা কামাল।

আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেল ড. আজদা। দুঃখের মধ্যে তার মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘ফুপু আম্মা আমার কথাই বলেছেন। প্লিজ, আপনি হ্যাঁ বলুন। আর আরিয়াস-আরারাত অঞ্চলে যখন আপনি থাকছেন, তখন এখানে থাকাই সব দিক দিয়ে ভালো হবে।’ আহমদ মুসার উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে বলল ড. আজদা।

‘ধন্যবাদ, এ অঞ্চলে কোথাও আমাকে থাকতে হবে আর সে থাকাটা এখানে হলে আমার আপত্তি নেই। আর ফুপুজি ঠিকই বলেছেন, পুলিশকে হায়ার করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট পুলিশরাও এতে কিছু উপকৃত হয়। ওদের সার্ভিস ভালো পাওয়া যায় এবং ওদের কিছু নিয়ন্ত্রণও। এটা ইমিডিয়েটলি করা দরকার। দরখাস্ত নিয়ে গেলে থানা ইনচার্জ ওপর থেকে মৌখিক অনুমতি নিয়ে এখনি এটা করে দিতে পারে।’

‘আমিই যাচ্ছি।’ বলে ড. সাহাব নুরী উঠে গিয়ে একদৌড়ে একশিট কাগজ ও কলম নিয়ে এল। কাগজ ও কলম ড. আজদাকে দিয়ে বলল, ‘নিজ হাতেই তুমি দরখাস্তটা লিখে দাও।’

ড. আজদা দরখাস্ত লিখে ড. সাহাব নুরীর হাতে দিয়ে বলল, ‘মামা, কিছু পয়সা ওদের এ্যাডভান্স করতে হয়।’

‘সে তুমি ভেব না মা। যা দরকার আমি করে আসব।’

বলে দরখাস্ত নিয়ে বেরিয়ে গেল ড. সাহাব নুরী।

ড. সাহাব নুরী বেরিয়ে গেলে ড. আজদার ফুপা তুরস্ক বিশেষ করে এ অঞ্চলের পুলিশের অবস্থা নিয়ে কথা তুলল।

এ নিয়ে কিছুক্ষণ কথা চলল।

এই কথার মধ্যেই পরিচারিকা এল চা নিয়ে।

চা খাওয়া চলছে। এই সময় বাড়ির কেয়ারটেকার লোকটি অনুমতি নিয়ে লাউঞ্জে প্রবেশ করল। দরজা পেরিয়ে করিডোরের মুখে দাঁড়িয়ে ড. আজদাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ছোট ম্যাডাম, ইজডির হোম সার্ভিসের গাড়ি এসেছে। কিছু প্রয়োজন আছে? বলবেন কিছু?'

'হ্যাঁ আংকল, ওদের দাঁড়াতে বলুন। আমি আসছি।'

চলে গেল কেয়ারটেকার।

ড. আজদা উঠতে যাচ্ছিল।

'হোম সার্ভিস কি নিয়মিত আসে?' জিজ্ঞেস করল ড. আজদাকে।

ড. আজদা আবার বসে পড়ল। বলল, 'স্যার, নিয়মিতই বলা যায় আসে।'

'কোন বিশেষ কোম্পানী, না যে কোন কোম্পানী?' আহমদ মুসা বলল।

'অনেক কোম্পানী আছে, কিন্তু ইজডির কোম্পানীর জিনিস নিয়ে থাকি।' বলল আজদা।

'হোম সার্ভিস তো খুব সকালে আসে।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

'জ্বি, এর চেয়ে সকালে আসে। আজ এক ঘণ্টার মত লেইট করেছে।' ড. আজদা বলল।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

ভাবনার একটা ঝিলিক খেলে গেল আহমদ মুসার মুখে। বলল, 'ড. আজদা, আপনি বসুন। আমি গাড়ির দিকে একটু যাই, তারপর আপনি যাবেন।'

কৌতুহলের চিহ্ন ফুটে উঠল ড. আজদার চোখে-মুখে। পরপরই দুর্ভাবনার একটা কালো ছায়া নামল সেখানে। প্রশ্ন জেগে উঠল তার চোখে। কিন্তু প্রশ্ন না করে বলল, 'ঠিক আছে স্যার, আমি বসছি।'

আহমদ মুসা উঠে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল, হোম সার্ভিসের গাড়িটা বারান্দার ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। বিস্মিত হলো সে এই দেখে যে, গাড়িটা তার মুখ ইতোমধ্যে ঘুরিয়েও নিয়েছে। ফেরার জন্যে সে প্রস্তুত।

হোম সার্ভিসের গাড়িগুলো কোনটা পেছন দরজা আবার কোনটা পাশের দরজা দিয়ে সাপ্লাই দেয়। কিন্তু গাড়ির কোন দরজাই খোলা নেই। ড্রাইভার তার ড্রাইভিং সীটে। আর 'ইজডির হোম সার্ভিস কোম্পানী লিমিটেড'-এর ইউনিফর্ম পরা একজন লোক হাতে রিসিট ও কলম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ শুকনো ও চোখ দু'টিতে ভয়ের ছায়া দেখতে পেল সে।

আহমদ মুসার মনের অস্পষ্ট আশংকাটা এবার বাস্তব রূপ নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা তার জ্যাকেটের বড় পকেট দু'টিতে হাত পুরে গাড়ি বারান্দায় নামল। বলল কোম্পানীর লোকটিকে লক্ষ্য করে, 'ছোট ম্যাডাম অসুস্থ বোধ করছেন। আমিই সাপ্লাই নেব, তুমি বিস্কুট ছাড়া বেকারী আইটেমের...।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না। হঠাৎ উঁচু গাড়ির ওপরের অর্ধেকটা ঘর্ষণের মত একটা ধাতব শব্দ তুলে চোখের পলকে নিচে নেমে গেল।

উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া পথে দেখা গেল গাদাগাদি করে দাঁড়ানো অনেকজন মানুষ। সবার হাতে স্টেনগান। সামনে যারা দাঁড়ানো, টার্গেট লক্ষ্যে উঠে আসছে তাদের হাতের স্টেনগান।

ঘর্ষণের ধাতব শব্দ আহমদ মুসার সপ্ত ইন্দ্রিয়কে সতর্ক করে দিয়েছিল। বেরিয়ে এসেছিল তার ডান হাত চোখের পলকে। তার তর্জনীটা আগে থেকেই তার এম-১০-এর ট্রিগার স্পর্শ করেছিল।

গাড়ির পেছনের স্লাইডিং ডোরটা কিছুটা নামতেই আহমদ মুসার চোখ গাড়ির ভেতরটায় পৌঁছে গিয়েছিল। আর তার তর্জনীটা হুকুম পেয়েছিল সংগে সংগেই।

স্লাইডিং নেমে যাবার আগেই আহমদ মুসার এম-১০ গুলিবৃষ্টি শুরু করেছিল।

গাড়ির ভেতরে স্টেনগানধারীরা গাড়ির পেছনের দরজার ঘুলঘুলি দিয়ে নিরস্ত্র এবং হোম সার্ভিস আইটেমের অর্ডার দানরত আহমদ মুসাকে আগেই দেখেছিল। কিন্তু নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত এই লোকটির কাছ থেকে আক্রমণ হতে পারে, তা তারা কল্পনা করেনি। তারা মনে করেছিল, নিরস্ত্র এই কর্মচারী বা আত্মীয় লোকটিকে ধরে তার সাহায্যে ড. আজদাকে খুঁজে বের করে তাকে শেষ করার কাজটা আগে সমাধা করবে। আর যদি বাঁধা আসে, তাহলে সে কেন, কাউকেই ছাড়বে না। রক্তের নদী বইয়ে দিয়ে হলেও তারা বারজন আজ দু'বারের ব্যর্থ মিশন সমাপ্ত করেই ফিরবে।

কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত তারা আহমদ মুসার এম-১০-এর অসহায় শিকার হলো। যাদের হাতে স্টেনগান উদ্যত ছিল, তারা কিছুটা ওপরে উঠার সাথে সাথে গুলির ঝাঁকের গ্রাসে পরিণত হলো। তাদের পেছনে দাঁড়ানো অন্যরা স্টেনগান তাক করারও সুযোগ পেল না।

বারোজনের লাশে স্তুপীকৃত হয়ে পড়ল গাড়ির ভেতরটা।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে পালাচ্ছিল।

ভয়ে কম্পনরত কোম্পানীর সেলসম্যান লোকটা শুকনো কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, 'স্যার একজন পালাচ্ছে।'

আহমদ মুসা তাকাল সেদিকে। দেখল, গাড়ির ড্রাইভিং ডোরের নিচে একটা স্টেনগান পড়ে আছে। সন্ত্রাসীটি তখন দৌঁড়ে গাড়ির সামনে পনের-বিশ গজের মত চলে গেছে। আহমদ মুসা তার পায়ের দিকে লক্ষ্য করে এক পশলা গুলি করল। আহমদ মুসা চাচ্ছিল তাকে জীবিত ধরতে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ, লোকটি ঐখানে রাস্তার বাঁক ঘুরতে গিয়ে পায়ের সাথে পা বাড়ি খাওয়ায় পড়ে গেল। যে গুলি তার পায়ে লাগার কথা তা গিয়ে একদম লাগল তার বুকে।

অন্যদের মত সেও প্রাণহীন লাশ হয়ে গেল।

ড. আজদারা তখন কেউ আহমদ মুসার পেছনে, কেউ পাশে এসে দাঁড়াল।

ড. আজদা এসে আহমদ মুসার ডান পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। কাঁপছে সে। তাদের সকলের দৃষ্টি তখনও রাস্তার ওপর গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যাওয়া লোকটির দিকে। গাড়ির ভেতরে চোখ তাদের যায়নি।

পেছনে দাঁড়ানো লায়লা কামালই প্রথম দেখতে পেল ভয়াবহ দৃশ্যটা। বলল চিৎকার করে, 'আজদা গাড়ির ভেতরে দেখ।'

গাড়ির ভেতরে একবার তাকিয়েই চিৎকার করে উঠে ড. আজদা আহমদ মুসাকে আঁকড়ে ধরল।

'বোন আজদা আয়েশা, যুদ্ধক্ষেত্রে ভীত হবার কোন সুযোগ নেই।' নির্দেশসূচক গম্ভীর কণ্ঠ আহমদ মুসার।

আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে ড. আজদা মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। বিস্ময়কর এই মানুষটি তাকে বোন ডেকেছেন। কখন মহীরূহ রূপ এই মানুষটিকে সে জড়িয়ে ধরেছিল, সে বুঝতেই পারেনি। মনোবিজ্ঞানীও কি এই লোকটি! ঠিক প্রয়োজন মুহূর্তেই তিনি তাকে বোন সম্বোধন করেছেন। অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে নুয়ে এল ড. আজদার মাথা। গত ১২ ঘন্টারও কম সময়ে এই মহান লোকটি তাকে তিনবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। সে তো হোম সার্ভিসের কাছে আসার জন্যে উঠেই ছিল। এলে তো তাকেই এখন লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হতো!

'ড. আজদা আয়েশা, তাড়াতাড়ি থানায় খবর দিন। ড. সাহাব নুরী নিশ্চয় এখনও থানায় আছেন। পুলিশ নিয়ে আসতে বলুন তাকে।' বলল আহমদ মুসা ড. আজদাকে।

'জ্বি ভাইয়া, আমি যাচ্ছি, এখনি থানায় খবর দিচ্ছি।' অনেকটা রোবটের মত কথা বলল ড. আজদা। ঘটনার ভয়াবহতা তাকে যে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, সে ঘোর এখনও তার কাটেনি।

ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি ও ফুপু লায়লা কামালও অনেকটা নির্বাক। কি করে কি ঘটল, তা জিজ্ঞেস করার ভাষাও তারা যেন ভুলে গেছে। শুধু এটুকুই বুঝছে, হোম সার্ভিসের ছদ্মবেশে সন্ত্রাসীরা এসেছিল। আতংকে তারা

শিউরে উঠছে এই ভেবে যে, হোম সার্ভিসের কাছে আসার জন্যে আজদা তো উঠেই দাঁড়িয়েছিল, আসলে তো সে-ই লাশ হয়ে যেত।

আহমদ মুসা হাতের রিভলভারটি পকেটে রেখে ডাকল ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কোম্পানীর সেলসম্যান ছেলেটিকে।

ছেলেটি কাঁপতে কাঁপতে এসে আহমদ মুসার কাছে দাঁড়াল।

'সন্ত্রাসীরা তোমাকে এবং তোমার গাড়ি কোথায় পেল?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা ছেলেটিকে।

ছেলেটি কেঁদে ফেলল। বলল, 'আমরা এদিকে আসছিলাম। 'এলিকয়' চৌরাস্তার ক্রসিংয়ে এরা গাড়ি থামায় এবং বলে, আমরা বেশি পরিমাণে বেকারীর জিনিস কিনব। আমাদের সাথে চল। বলে আমাদের আরাস নদীর তীরে পাহাড়ের আড়ালে এক নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। আমাদের ড্রাইভারকে ওরা মেরে ফেলে এবং বলে, তাদের কথামত কাজ না করলে আমাকেও মেরে ফেলবে। আমাদের গাড়ি থেকে সব মাল নামিয়ে ওরা বারজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গাড়িতে উঠে বসে। ওদের অন্য একজন গাড়ি চালিয়ে এখানে নিয়ে আসে।'

'ওদের নিজেদের মধ্যে কোন কথা বলতে শুনেছ কিংবা ওরা টেলিফোনে কারও সাথে কথা বলেছে কিনা?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'স্যার, ওদের কারও হাতে মোবাইল দেখিনি। আমি ড্রাইভারের পাশে বসেছিলাম। সে কোন কথা বলেনি।' বলল ছেলেটি।

'ঠিক আছে, ভয় নেই। পুলিশ জিজ্ঞেস করলে সত্য যা তাই বলবে।' আহমদ মুসা বলল।

টেলিফোন করে ভেতর থেকে আজদা এল। বলল, 'স্যার, পুলিশ রওয়ানা দিয়েছে। মামারও কাজ হয়ে গেছে। তিনিও আসছেন।'

'ভাই বলার পর আবার 'স্যার' কেন?' বলল আহমদ মুসা আজদাকে। তার মুখে হাসি।

'অভ্যাস হয়ে গেছে তো। আর বলব না। কিন্তু 'বোন' বলার পর 'আপনি' সম্বোধন করছেন কেন? এসবও তাহলে চলবে না। ড. আজদা নয়, শুধু আজদা আয়েশা আমি।'

‘ঠিক আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ড. বারজেনজো শুনলে খুব খুশি হবে। সে আপনার দারুণ ভক্ত হয়ে গেছে। সকাল থেকে এ পর্যন্ত দু’বার টেলিফোন করেছে। আমি মামা, ফুপা-ফুপিদের পরিবর্তনের কাহিনী তাকে বলেছি। সে দারুণ খুশি হয়েছে। সে চাচ্ছে, তার পরিবারের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে। ওখানে নাকি আপনি আরও ভালো করতে পারবেন।’ বলল ড. আজদা।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। পুলিশের গাড়ি আসতে দেখে থেমে গেল আহমদ মুসা।

পুলিশের দু’টি গাড়ি। তাদের মধ্যে একটা ড. সাহাব নুরীর গাড়ি।

পুলিশের গাড়ি দু’টি গাড়ি বারান্দা থেকে বেরিয়ে রাস্তাটি যেখানে বাগানের দিকে টার্ন নিয়েছে, সেখানে একটি লাশ পড়েছিল, তার পেছনে এসে দাঁড়াল।

থানার ইনচার্জ অফিসার মোস্তফা ওকালান লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে লাশটা ভালো করে দেখল। তারপর চারদিকটার ওপর চোখ পড়তেই ‘সালাম’ দিয়ে হোম সার্ভিসের গাড়ির দিকে এগোলো।

গাড়ির পেছনে আহমদ মুসাসহ সকলেই দাঁড়িয়েছিল।

পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান আহমদ মুসার সামনে এসে বলল, ‘এখানেই তো লাশগুলো?’

‘জ্বি হ্যাঁ, গাড়ির ভেতরে।’ আহমদ মুসা বলল।

গাড়ির পেছন ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভেতরটা সে একবার গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, ‘অভিনন্দন আপনাকে। সন্ত্রাসীদের আপনি গাড়ি থেকে নামতেই দেননি। বুঝতে পারছি, ওরা হোম সার্ভিসের ছদ্মবেশে এসেছিল। গাড়িতে হোম সার্ভিসের পণ্যের বদলে ছিল ওরা ১২ জন সন্ত্রাসী। ওরা ভেবেছিল, বাড়িতে যেহেতু মেহমান ছাড়া বাড়ির দায়িত্বশীল আর কেউ নেই, তাই ড. আজদাই অর্ডার নিয়ে আসবে। আর তাকে খুন করে তারা পালিয়ে যাবে। যদি আজদা না আসে তাহলে বাড়িতে ঢুকে তাকে

খুঁজে বের করে খুন করার মত জনশক্তি নিয়ে তারা এসেছিল। কিন্তু তারা গাড়ি থেকে বের হতেই পারেনি। কি ঘটেছিল বলুন তো।'

আহমদ মুসা গোটা কাহিনীটা সংক্ষেপে বলল।

পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান কাহিনী শোনার পর তার চোখ-মুখের ওপর দিয়ে বিস্ময় ও কৌতুহলের ঢেউ খেলে গেল। ফুটে উঠল তার চোখে আহমদ মুসার প্রতি একটা সমীহ দৃষ্টি। বলল, 'আপনি ড. আজদাকে বাঁধা দিলেন কেন? আপনার মনে হোম সার্ভিস সম্পর্কে সন্দেহ হলো কেন?'

'বিষয়টা খুব সাধারণ ছিল। যে বাড়িতে রাতে এত গুলি-গোলা হলো, যে বাড়িতে পুলিশের এত আনাগোনা, যা আশেপাশের লোকেরা সবাই জানতে পেরেছিল, সে বাড়িতে সকালে হোম সার্ভিসের গাড়ি আসার বিষয়টা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি। দ্বিতীয়ত, গাড়িটা নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে আসাটা আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে। কারণ, হোম সার্ভিসের রুট শিডিউল, টাইম শিডিউল থাকে, সেটা ব্রেক করে না। হয় ঠিক সময়ে আসবে, না হলে আসেই না। কাস্টমাররাও এটা জানে। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় আক্রমণের প্রকৃতি দেখে আমার আশংকা হয়েছিল, শত্রুদের তৃতীয় আক্রমণও এ পক্ষ গুছিয়ে উঠার আগেই ঘটতে পারে। রাতের ঘটনার পর পুলিশ ও অন্যান্য ঝক্কি ঝামেলা সামলাতে এ পক্ষের সকাল হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এ পক্ষের সকালটা কাটবে অনেকটা নিশ্চিন্ত ও শিথিলভাবে। এই অবস্থা শত্রুপক্ষের তৃতীয় আক্রমণের জন্যে খুব অনুকূল হতে পারে। এ আশংকা মনে থাকায় হোম সার্ভিসের গাড়িকে সন্দেহের চোখে দেখা স্বাভাবিক ছিল।' বলল আহমদ মুসা।

পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালানের চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, 'মি. আবু আহমদ আবদুল্লাহ, নিশ্চয় আপনি কোন গোয়েন্দা সার্ভিসের লোক। পরিচয় আপনি গোপন করছেন। অথবা আপনি নিশ্চয় আর এক শার্লক হোমস। শার্লক হোমসের মতই আপনার বিবেচনা-বিশ্লেষণে কোন খুঁত নেই। ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু মি. আবু আহমদ আবদুল্লাহ, আপনি ভিমরুলের চাকে ঢিল দিয়েছেন। ভালো ছিল এদের না ঘাঁটানো। এদের শক্তি সম্পর্কে আমার কোন আন্দাজ নেই, আপনিও পারবেন না।'

‘কারা এরা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি জানি না। এরা বহুরূপী। এদের আসল রূপ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। এরা অপরাধী সংগঠন নয়। বরং এরা পুলিশকে অপরাধ দমনে সাহায্য করছে। তাদের সাহায্যেই এই অঞ্চলের ড্রাগ-নেটওয়ার্ককে ভেঙে ফেলা গেছে। বহু অপরাধী ধরা পড়েছে। তাদের সাহায্যে বাকিদেরও আমরা ধরে ফেলব। শুধু ড্রাগ-ব্যবসায় নয়, চুরি, ডাকাতি, খুন সব অপরাধ দমনের ক্ষেত্রেই তারা সাহায্য করছে। এদের সাথে বারজানি পরিবারের এই সংঘাতকে আমরা দুঃখজনক মনে করছি। ড. আজদার ভাই আতা সালাহ উদ্দিন বারজানি অপরাধ করেই জেলে গেছে। ড. আজদার কোন অপরাধ আমরা পাইনি। কিন্তু তার সাথে ওদের সংঘাত বাঁধল কেন? ওরা কেন ড. আজদাকে মারতে চায়, এ প্রশ্নেরও আমাদের কাছে কোন জবাব নেই। জানি না, তদন্ত কতদূর কি করতে পারবে!’

ড. আজদা, ড. সাহাব নুরী, কামাল বারকি ও তার স্ত্রী লায়লা কামাল গোগ্রাসে গিলছিল আহমদ মুসা ও পুলিশ অফিসারের মধ্যেকার কথাগুলো।

‘ওরা পুলিশকে এই সাহায্য করছে কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পুলিশকে সহযোগিতা করা তো সব নাগরিকের দায়িত্ব।’ বলল পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান।

‘ওদের বহুরূপী বললেন কেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘এই কারণে যে, এই সাহায্যের কাজটা তারা নানা নামে করে। তবে তারা যে সবাই মিলে এক, সেটা আমরা বুঝি। তাহলে কেন বহু নাম, এক নাম নয়, সেটা আমরা জানি না। অবশ্য এ নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। সাহায্য করছে, এটাই আমাদের কাছে বড় কথা, নাম নয়।’

‘আচ্ছা অফিসার, এই এলাকায় নতুন বসতি এবং পুরাতনরা উচ্ছেদ হওয়া, এ সম্পর্কে কিছু জানেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘উচ্ছেদের ঘটনা আমাদের সামনে আসেনি। জমি-জমা, বাড়ি-ঘর বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাবার ঘটনা আছে। এ ধরনের অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন তো স্বাভাবিক ব্যাপার। নতুন বসতি বলতে যা ঘটছে, সেটাও স্বাভাবিক। দেশের

অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক মানুষ জমি-জমা কিনে এখানে বসতি করছে। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই।'

'কারা যাচ্ছে, কারা আসছে, এ বিষয়টা আপনারা কখনও ভেবে দেখেছেন?' বলল আহমদ মুসা।

'না, এরকম কিছু আমরা দেখিনি, আমাদের দেখার কথাও নয়। কিন্তু এ ধরনের প্রশ্ন কেন করছেন বুঝতে পারলাম না।' বলল থানা ইনচার্জ অফিসার মোস্তফা ওকালান।

'এমনিই বলছিলাম। তবে তুরস্কে জাতিগত একটা সংঘাত তো আছেই, তাই না? যেমন দেখুন, আর্মেনীয়রা এখনও সমস্যা হয়েই আছে।' বলল আহমদ মুসা।

থানা ইনচার্জ মোস্তফা ওকালান তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'মি. আবু আহমদ আব্দুল্লাহ, আপনি অনেক জানেন। আপনি খুবই দূরদর্শী। আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমরা সরকারি চাকুরে। বেশি জানতেও নেই, বেশি বলতেও নেই।'

বলেই মোস্তফা ওকালান নড়েচড়ে উঠে বলল, 'কাজ শুরু করি। আমাদের বড় স্যার খাল্লিকান খাচিপ আসতে চেয়েছিলেন। শেষে জানালেন আসছেন না। আগের মতই এ ঘটনাটা। তদন্ত একই রকম হবে। তবে তিনি বলেছেন, কেস শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি ইজডির বাইরে যাবেন না।' থামল মোস্তফা ওকালান।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আপনার স্যার আইনের কথা বলেননি। আমি আসামী নই। তাকে বলবেন, আমি তার আদেশ মানতে বাধ্য নই। আমি ইজডিতে থাকলে আমার ইচ্ছাতেই থাকব।'

'মি. আবু আহমদ, এ বিষয় নিয়ে কথা বাড়াবার দরকার নেই। এসব ব্যাপার আমার ওপর ছেড়ে দিন।' বলল থানা ইনচার্জ মোস্তফা ওকালান।

কথা শেষ করে মোস্তফা ওকালান পেছন ফিরে সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের কাজ কত দূর?

‘স্যার, সুরতহাল শেষ হয়েছে। নিচের লাশটি গাড়িতে তোলা হয়েছে। এখন আমরা ওদের বক্তব্য এখানেও নিতে পারি। আবার ওরা থানায় মামলা রেকর্ড করাতে পারেন।’ বলল মোস্তফা ওকালানের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর।

মোস্তফা ওকালান তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

‘আমরা থানায় যাব মামলা রেকর্ড করার জন্যে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক আছে।’ বলে মোস্তফা ওকালান হোম সার্ভিসের সেলসম্যান ছেলেটিকে ডেকে বলল, ‘গাড়িটিকে ওরা কোত্থেকে হাইজ্যাক করেছে?’

ছেলেটি কাঁপতে কাঁপতে বলল, ‘স্যার, এলিকয় ক্রসিং থেকে ওরা আমাদের কিছু জিনিস কিনবে বলে নিয়ে যায়। আরাস নদী এলাকায় একটা পাহাড়ের আড়ালে নিয়ে আমাদের ড্রাইভারকে ওরা হত্যা করে এবং গাড়ির জিনিসপত্র ওখানে নামিয়ে ফেলে। হত্যার ভয় দেখিয়ে ওরা বাধ্য করে আমাকে তাদের কথামত কাজ করতে।’

মোস্তফা ওকালান তার সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরকে ডেকে বলল, ‘তুমি ছেলেটিকে গ্রেফতার কর। আর থানায় টেলিফোন করে আরাস নদীর ঐ পাহাড়ী এলাকা থেকে নিহত ড্রাইভার ও গাড়ির মালামাল উদ্ধার করে আনতে বল।’

স্যালুট দিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর হোম সার্ভিসের সেলসম্যান ছেলেটিকে নিয়ে একজন পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘একে গাড়িতে তোল।’ তারপর ওয়্যারলেসে কথা বলতে লাগল থানার সাথে।

আহমদ মুসা ও ড. আজদা তৈরি হবার জন্যে চলল বাড়ির ভেতরে। তাদের সাথে ড. সাহাব নুরী এবং কামাল বারকি ও লায়লা কামাল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকেই ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি বুকে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, ‘বেটা, নিশ্চয় আল্লাহর কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে তোমার। তুমি আজদাকে হোম সার্ভিসে যেতে বাঁধা না দিলে সে বেঘোরে মারা পড়ত। আমরা তুরস্কের হয়েও যা জানি না, তা তুমি জান কি করে? আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন বেটা।’

আহমদ মুসা কামাল বারকিকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, ‘আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। তিনি যেন সব সময় আমাদের এভাবে সতর্ক হবার সুযোগ দেন।’

‘ফি আমানিল্লাহ। তুমি ঠিক বলেছ বেটা। পুলিশের দারোগা ওকালানও দেখছি ভয় করে এ সন্ত্রাসীদের।’ বলল কামাল বারকি।

আহমদ মুসা নিচতলার লাউঞ্জে প্রবেশ করে তার ঘরের দিকে যাচ্ছিল।

‘ভাইয়া, আপনার ঘর ওদিকে নয়। আপনার ঘরের ‘মেরাজ’ হয়েছে।’ বলল ড. আজদা। তার ঠোঁটে হাসি।

‘মেরাজ মানে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘মেরাজ মানে আপনার ঘরের দু’তলায় ঊর্ধ্বগমন ঘটেছে। এখন থেকে দু’তলায় থাকবেন। আপনি কাছাকাছি থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকব, এই চিন্তাতেই আমরা এটা করেছি। চলুন, আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।’ বলল ড. আজদা। কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা।

হাঁটতে লাগল ড. আজদাও।

ড. আজদার মামা ও ফুপা-ফুপিরা লাউঞ্জের সোফায় বসে বলল, ‘আমরা আর ওপরে উঠছি না। তোমরা তৈরি হয়ে এস। আমরা এখানেই বসছি।’

দু’তলায় উঠে গেল আহমদ মুসা ও ড. আজদা।

সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল লায়লা কামাল, ড. আজদার ফুপি। বলল, ‘এই জুড়িটা যদি জীবনের জন্যে হতো, তাহলে হাতে স্বর্গ পেতাম।’

‘ওরকম চিন্তা করে ওদের সম্পর্ককে ছোট করো না। আবু আহমদ আব্দুল্লাহ ছেলেটা একেবারেই অতুলনীয়। সব দিক থেকেই অসম্ভব সচেতন। দেখ, আজদা গাড়ির ভেতর রক্তে ডুবে থাকা লাশের স্তুপ দেখে আকস্মিকভাবে ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পাশে পেয়ে জড়িয়ে ধরেছিল আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে। মানুষের মন বড় বিচিত্র। অনেক সময় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক যুগে যা ঘটে না, এক মুহূর্তেই তা ঘটে যেতে পারে। আবু আহমদ আব্দুল্লাহ তেমন কিছুর পথ বন্ধ করার জন্যেই নিশ্চয় কোন দেরি না করে ‘বোন’ বলে সম্বোধন করেছিল আজদাকে।’ বলল কামাল বারকি, ড. আজদার ফুপা।

‘ধন্যবাদ ভাইসাহেব, বিষয়টা আমিও লক্ষ্য করেছি। সুন্দরী মেয়ের স্পর্শকে নানা পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন কারণে প্রশ্রয় না দেবার লোক হয়তো আছে, কিন্তু সংগে সংগেই তাকে বোন বলার মত সততা দেখানোর লোক আমি দেখিনি।

সোনার মানুষ কেমন হয় আমি জানি না, কিন্তু সোনার মানুষ যদি কাউকে বলতে হয়, তাহলে তাকেই বলতে হবে। গত পনের-বিশ ঘণ্টার ইতিহাস এটাই বলে।'

দু'তলা থেকে নেমে এসেছে আহমদ মুসা ও ড. আজদা। ড. সাহাব নুরীর শেষ কয়েকটা কথা তাদের কানে গেল।

'বিশ ঘণ্টার ইতিহাস কি বললে মামা?' বলতে বলতে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল ড. আজদা। কিছুটা পেছনে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা।

'না, কিছু না। আমরা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তোমরা যাচ্ছ? গিয়ে কি হয়, আমাদের টেলিফোন করো। আমরা চিন্তায় থাকব।' বলল ড. সাহাব নুরী।

'হ্যাঁ মামা, আমরা যাচ্ছি। দোয়া করো।' বলল ড. আজদা।

'হ্যাঁ, আসছি আমরা। পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান এখন টেলিফোন করেছিলেন, আমরা পাহারার জন্যে যে পুলিশ চেয়েছিলাম তারা এসেছে। দিনে দু'জন পুলিশ পাহারায় থাকবে, রাতে চারজন। আপনারা ওদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলে ভালো হয়।' বলল আহমদ মুসা।

সালাম দিয়ে হাঁটা শুরু করল বাইরে বেরুবার জন্যে।

ড. আজদাও তার পিছু নিল।

৪

সকাল ৭টা। কুরআন পড়া শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই ঘরে ঢুকল ড. সাহাব নুরী। সালাম দিয়েই আহমদ মুসাকে বলল, 'মি. আবু আহমদ আব্দুল্লাহ, আপনি কি একটু সময় দেবেন?'

'এটা তো জিজ্ঞাসা বা সম্মতি দেয়ার বিষয় নয়! আপনাকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার বলুন তো?' বলল আহমদ মুসা।

'মধ্য ভ্যান-এ আমার বন্ধু পরিবার সাংঘাতিক বিপদে পড়েছে। সেখানে আমাকে এখনি যেতে হবে। আপনিও যদি যান।'

গত রাতেই ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদার সাথে আহমদ মুসা লেকসিটি ভ্যান শহরে এসেছে। এই ভ্যান শহরের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ভ্যান স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. সাহাব নুরী।

আহমদ মুসা ভ্যানে এসেছে পুলিশ রেকর্ড থেকে উল্কিওয়ালাদের সম্পর্কে খোঁজ নেবার জন্যে। এ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের যারা মারা পড়েছে, সবাই উল্কিওয়ালা। সুতরাং উল্কিওয়ালাদের সম্পর্কে জানলে অগ্রসর হওয়া সহজ হবে। জানা যাবে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সবই।

ড. সাহাব নুরীর কথা শেষ হতেই ঘরে প্রবেশ করেছে ড. আজদা।

'কি বিপদ মি. সাহাব নুরী? আপনার এ বন্ধু কে বা কারা?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমার অভিভাবক এবং শিক্ষক সাংঘাতিক পুলিশী ঝামেলায় পড়েছেন। এখনি যেতে হবে সেখানে। ওরা খুবই আপসেট হয়ে পড়েছেন।' বলল ড. সাহাব নুরী।

'কাদের কথা বলছেন? কারা বিপদে পড়েছেন মামা?' ড. আজদার জিজ্ঞাসা।

‘তুমি জান তাকে। ভ্যান পুরাতত্ত্ব জাদুঘরের প্রধান এবং জাদুঘরের মাউন্ট আরারাত সেকশনের বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক ড. মাহজুন মাজহার। জাদুঘরে আজ কি এক ডাকাতি হয়েছে। এজন্যে পুলিশ তার বাড়ি ঘিরে রেখেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার বাড়িতে আরও পুলিশ আসবে। স্যার খুব সরল-সোজা বিজ্ঞানী মানুষ। খুব নাকি ভেঙে পড়েছেন।’

ভ্যান জাদুঘরের মাউন্ট আরারাত সেকশনের বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক শুনেই আহমদ মুসার আগ্রহ দারুণ বেড়ে গেল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা।

তার আগেই ড. আজদা কথা বলা শুরু করেছে। বলছে, ‘মামা, ঐ স্যারের মেয়ে সাহিবা সাবিত তো আমার বান্ধবী। কলেজে ক্লাসমেট ছিল আমার। এখন সে ভ্যান বিশ্ববিদ্যালয়েই পুরাতত্ত্বের ওপর পিএইচডি করছে। গতকালও টেলিফোনে তার সাথে আমার কথা হয়েছে। আমাকেও যেতে হবে।’

‘বেশ, চল। ভালোই হলো। কিন্তু মি আবু আহমদ আব্দুল্লাহ, আপনাকে যেতেই হবে।’ বলল ড. সাহাব নুরী।

‘না ডাকলেও আমি যাব। ড. মাহজুন মাজহারকে আমারও প্রয়োজন। চলুন। আমি প্রস্তুত।’ আহমদ মুসা বলল। তার মুখে হাসি।

‘ধন্যবাদ আবু আহমদ আব্দুল্লাহ। আমি কৃতজ্ঞ। আপনাকে সেখানে খুব বেশি প্রয়োজন। আসুন।’

বলে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্যে হাঁটা শুরু করল ড. সাহাব নুরী।

‘চলুন ভাইয়া, ওরা খুব ভালো মানুষ। কিন্তু ভীষণ বিপদ ওদের।’ বলল ড. আজদা।

‘কিন্তু ঘটনাটাই এখনও জানতে পারলাম না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ছয়টার খবরে না বললেও আটটার খবরে নিশ্চয় বিস্তারিত বলবে। আর কাগজেও বিস্তারিত জানতে পারব। ওখানে গিয়েই আমরা কাগজ পেয়ে যাব।’ বলল ড. আজদা।

আহমদ মুসা ও ড. আজদা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সকালের প্রাচীন ও ব্যস্ত শহর ভ্যান। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। সকাল সাড়ে ৭টার মধ্যে পৌঁছে গেল তারা ড. মাহজুন মাজহারের বাড়িতে।

ড. মাহজুন মাজহারের বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি। তাদের বাগানঘেরা দু'তলা বাংলো সাইজের বাড়ির সব দিকেই পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

নিচেই বাড়ির গেটে দাঁড়িয়েছিল সাহিবা সাবিত। তার চোখে –মুখে উদ্বেগের বিস্ফোরণ।

ড. সাহাব নুরী গাড়ি থেকে নামতেই সাহিবা সাবিত এসে তাদের ওপরে নিয়ে চলল। যাবার পথেই ড. আজদা সাহিবা সাবিতকে আহমদ মুসার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলল, 'তোমাকে যে মেহমানের কথা বলেছিলাম, ইনি তিনিই। আমাদের পরিবারের চরম বিপদের সময়ের পরম বন্ধু। ইনি আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।'

শুনেই দাঁড়িয়ে গেল সাহিবা সাবিত।

সাহিবা সাবিতের মুখে দুঃখের মধ্যেও ফুটে উঠেছে বিস্ময় আর আনন্দের ঔজ্জ্বল্য।

হালকা নীল ট্রাউজারের ওপর সাদা শার্ট পরা সুন্দরী তরুণী সাহিবা সাবিত বাউ করল আহমদ মুসাকে। বলল, 'আজদা আমাকে আপনার সম্পর্কে এত কথা বলেছে যে, আমি আপনাকে শার্লক হোমস ভেবে বসে আছি। তবে ইংরেজ শার্লক হোমসের চেয়ে আপনি অনেক সুন্দর। ওয়েলকাম স্যার।'

'ধন্যবাদ সাহিবা সাবিত। আমি আপনাকে অন্য একটা অনুরোধ করব। আমার এখনি একটা পত্রিকা দরকার, যাতে মিউজিয়ামের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট আছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আজকের সবগুলো পত্রিকাই আমি কিনেছি। চলুন, দেখবেন।'

বলে আবার হাঁটতে শুরু করল সাহিবা সাবিত।

সাহিবা সাবিত আহমদ মুসাদেরকে একেবারে ভেতরে ফ্যামিলি ড্রইংরুমে নিয়ে এল। সেখানেই বসেছিল তার আব্বা ভ্যান পুরাতত্ত্ব মিউজিয়ামের প্রধান ড. মাজহার।

আহমদ মুসাদেরকে দেখে ড. মাহজুন মাজহার উঠে দাঁড়িয়েছে। স্বাগত জানাল ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদাকে। আহমদ মুসার ওপর চোখ পড়তেই থমকে গেল তার কথা। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ড. সাহাব নুরীর দিকে।

কিন্তু সাহাব নুরী কিছু বলার আগেই সাহিবা সাবিত বলল, 'বাবা, ইনিই আবু আহমদ আব্দুল্লাহ। আজদাদের বিপদে হাতেম তায়ী হয়ে এসেছে। তবে বাবা, এই হাতেম তায়ী কিন্তু একইসাথে শার্লক হোমস ও রবিনহুড।'

'পুরাতত্ত্বের বর্ণনায় বিশেষণের ব্যবহার হয় না। কিন্তু মিস সাহিবা সাবিত পুরাতত্ত্বের ছাত্রী হয়ে যেভাবে বিশেষণের ব্যবহার করছেন, তা অবাক হওয়ার মত। যাক।'

বলে আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে দিল ড. মাহজুন মাজহারের দিকে।

আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেইক করে বলল, 'ইয়ংম্যান, বিশেষণ আসে আসলে মানুষ যা আশা করে, তার চেয়ে বেশি পাওয়ার ইমোশন থেকে। সব কথা ধরতে নেই। যাক, হাতেম তায়ী, শার্লক হোমস কিংবা রবিনহুড না হোক, বিপদের সময় যে কোন শুভাকাংক্ষীর উপস্থিতি মূল্যবান।'

'ধন্যবাদ স্যার। আপনাদের ঘটনার কথা শুনেছি। অনুমতি হলে আজকের কাগজগুলো আমি দেখতে চাই। জানতে চাই পুরো ঘটনা।' বলল আহমদ মুসা।

ড. মাহজুন মাজহার তাকাল মেয়ে সাহিবা সাবিতের দিকে।

সাহিবা সাবিত আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আসুন স্যার।' বলে সাহিবা সাবিত হাঁটতে লাগল।

পেছনে আহমদ মুসাও।

ফ্যামিলি ড্রইংরুমের ওপাশে পরিবারের মিডিয়া রুম। সে রুমে টেলিভিশন, রেডিও, কম্পিউটার, সংবাদপত্র এবং ছোট ছোট ওয়াল-ক্যাবিনেটগুলোতে বাছাই করা কিছু বই।

দৈনিক কাগজগুলো নিয়ে বসলো আহমদ মুসা একটা টেবিলে।

'স্যার, আপনি বসুন। আমি ওদিকটা খোঁজ নিই। পুলিশ হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবেন।' বলল সাহিবা সাবিত।

‘ঠিক আছে। পুলিশ এলে আমাকে একটু জানাবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘শিওর স্যার। আপনার যে কোন সহযোগিতাকে ওয়েলকাম।’ বলল সাহিবা সাবিত।

বলেই ছোট একটা বাউ করে চলে গেল সাহিবা সাবিত।

কাগজগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল আহমদ মুসা। স্বাধীন ও সবচেয়ে দায়িত্বশীল ইংরেজি দৈনিক Van Times দেখল। ‘ভ্যান পুরাতত্ত্ব মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশনে রহস্যজনক হানা। ছয়জন প্রহরী সেনা নিহত। নিহত সন্ত্রাসীদের একজন।’

আহমদ মুসা শিরোনামটা পড়ার পর নিউজ পড়তে শুরু করলঃ

ভ্যান, ২ আগস্ট, রাত ৩টা। গত রাত দু’টায় ভ্যান পুরাতত্ত্ব মিউজিয়ামে এক দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী হানা হয়েছে। এই হানার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশন। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে কি ক্ষতি হয়েছে জানা যায়নি। সন্ত্রাসী-দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণে ছয়জন প্রহরী সেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়েছে। হানাদারদের একজন নিহত হয়েছে ঘটনা শেষে পালাবার সময়। মিউজিয়ামের প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ মাউন্ট আরারাত সেকশনের বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক ড. মাহজুন মাজহারের কোন গোপন ইনভলভমেন্ট এই ঘটনার সাথে যুক্ত থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘটনার প্রাপ্ত বিবরণ ও অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে, ঐতিহাসিক ভ্যান ক্যালিস প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত পুরাতত্ত্ব মিউজিয়ামে প্রবেশের জন্যে দুষ্কৃতিকারীরা তিন দিক থেকে অভিযান চালায়। এভেনিউয়ের পাশ ছাড়া এই তিন দিকেই পাহারা দেয়ার জন্যে সেনাক্যাম্প আছে। তিন ক্যাম্পে তিন শিফটে পাঁচ পাঁচ করে মোট পনের জন সৈনিক পাহারায় থাকতো। এভেনিউয়ের দিকের মূল গেটে দু’টি গার্ড বক্স। এর একটিতে পুলিশ অন্যটিতে মিউজিয়ামের নিজস্ব গার্ড সার্বক্ষণিক পাহারায় থাকতো।

দুষ্কৃতিকারীরা মূল গেট ছাড়া অন্য তিন দিক থেকে সন্তর্পণে ক্রলিং করে পাহারায় থাকা সেনাদের অলক্ষ্যে তাদের ক্যাম্প ঘিরে ফেলে অতর্কিতে তাদের

ওপর চড়াও হয়। সাইলেন্সার লাগানো অস্ত্রে তারা বেপরোয়া গুলি চালায়। এতে ৮ জন সেনা মারা যায়। আহতদের তারা বেঁধে মুখে টেপ পেস্ট করে দেয়। তারপর ধীরে-সুস্থেই যেন ভ্যান ক্যালিস প্রাসাদে প্রবেশ করে।

মিউজিয়ামের সব সিকিউরিটি ব্যবস্থা সম্পর্কে দুষ্কৃতিকারীরা অবহিত ছিল। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ও নেটওয়ার্কের একমাত্র সুইচটি ছিল মিউজিয়ামের রেক্টর ড. মাহজুন মাজহারের অফিস কক্ষে তার কম্পিউটার টেবিলের একটা গোপন স্থানে। সুতরাং তার অফিস কক্ষ বন্ধ থাকলে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ও এ্যালার্ম সিস্টেমকে অকেজো করার কোন উপায় থাকে না। রেক্টরের রুম ডিজিটাল লক ব্যবহার ছাড়া অন্যকোন উপায়ে খুলতে গেলে প্রধান গেটের সিকিউরিটি এ্যালার্ম বেজে উঠবে। আর রেক্টরের অফিস কক্ষের ডিজিটাল লক যদি প্রথম প্রচেষ্টায় খুলতে না পারে, একাধিক চেষ্টা করতে যায়, তাহলেও প্রধান গেটের সিকিউরিটি এ্যালার্ম বেজে উঠবে। দুষ্কৃতিকারীরা এ সব কিছুই জানতো। তারা রেক্টরের অফিস কক্ষের ডিজিটাল লক ব্যবহার করেই তার অফিসে প্রবেশ করে এবং ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, এ্যালার্ম নেটওয়ার্কের সুইচ অফ করে দেয়।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, দুষ্কৃতিকারীরা মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশন ছাড়া অন্য আর কোন সেকশনে প্রবেশ করেনি। এমনকি 'গোল্ড এন্ড ডায়মন্ড' সেকশনেও প্রবেশ করেনি। সেখানে রয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বছরের ভ্যান রাজবংশগুলোর স্বর্ণমুদ্রা ও গোল্ড-ডায়মন্ড অলংকারের নমুনা প্রদর্শনী। নমুনা প্রদর্শনী হলেও আজকের টাকায় তার মূল্য কোটি টাকা হবে। কিন্তু দুষ্কৃতিকারীরা সেদিকে যায়নি। তারা শুধুই প্রবেশ করেছে মাউন্ট আরারাত সেকশনে। এ সেকশনে আছে বিভিন্ন যুগে মাউন্ট আরারাতের ওপর লেখা পুরাতন সব পুস্তক- পুস্তিকা ও গ্রন্থের প্রদর্শনী। আর আছে সেখানে মাউন্ট আরারাতের ওপর তৈরি বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন সময়ের ভিডিও এবং প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন মানচিত্র এবং ফটোগ্রাফের সংগ্রহ। মাউন্ট আরারাত সেকশনেও তারা ডিজিটাল লক ব্যবহার করে প্রবেশ করে। এ ডিজিটাল লকেরও কোড একমাত্র রেক্টর সাহেবই জানেন। আর এ কোড তিনি সংরক্ষিত রেখেছেন তার কম্পিউটারের গোপন ফাইলে।

মিউজিয়ামের আরারাত সেকশনে একটা অবাক ব্যাপার দেখা গেছে। সেটা হলো, সেকশনের সবগুলো জিনিস যেমন ছিল তেমনি আছে। চোর-ডাকাত ঢুকলে বা কোন কিছু খোঁজার জন্যে কেউ ঢুকলে যেমন একটা লণ্ডভণ্ড দশা হওয়ার কথা, তেমন অবস্থা নয়। দুষ্কৃতিকারীরা কেন ঢুকেছিল, কি নিয়ে গেছে, তা এখনও পরিষ্কার হয়নি। লগ দেখে সবকিছু মেলানোর পর বোঝা যাবে কি হারিয়েছে।

এই রক্তাক্ত ও দুঃসাহসিক ঘটনা কে বা কারা ঘটাল তা পরিষ্কার হয়নি। দুষ্কৃতিকারীদের যে একজন মারা গেছে, তাকে প্রাথমিকভাবে তুর্কি নাগরিক বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে মনে করা হচ্ছে, ঘটনা যে বা যারাই ঘটাক, মিউজিয়ামের রেক্টরের সহযোগিতা ছাড়া হয়নি। কারণ, রেক্টরের কক্ষের এবং মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশনের ডিজিটাল লক খোলার ক্ষেত্রে তার সহযোগিতার বাইরে আর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। জানা গেছে, এই সন্দেহবশেই রাতেই ভ্যানের সম্মানিত প্রবীণ অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী ড. মাহজুন মাজহারের বাড়ি পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞ মহল বলছেন, কি সত্য বেরিয়ে আসবে তা পরে জানা যাবে, তবে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ড. মাহজুন মাজহারের মত একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে কোন প্রকার হয়রানি করা ঠিক হবে না। তিনি শুধুই একজন সম্মানিত ব্যক্তি নন, তার পরিবারও ঐতিহ্যবাহী। তুর্কি-আর্মেনীয় মিশ্র রক্তের এই পরিবারটির অবদান আছে ভ্যানের রাজনীতি ও ইতিহাসে। এই পরিবারটি অতীতেও দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে। ড. মাহজুন মাজহারের একজন কৃতী পূর্বপুরুষ, ভ্যান শহরের জনপ্রিয় মেয়র বেড্রোম কাপামাসি গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

সর্বশেষ খবর:

আমাদের পত্রিকার তৃতীয় সংস্করণ ছাপার জন্যে যখন প্রেসে যাচ্ছে, তখন সর্বশেষ খবর হলো, মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশন থেকে খৃস্টপূর্ব ৩শ' অব্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপ হারিয়ে গেছে। এই ম্যাপটি তৈরি হয়েছিল সেই সময়ের ওরান্তি রাজবংশের তত্ত্বাবধানে। ভিন্ন ধরনের এক গ্রীষ্মকালে মাউন্ট আরারাতের সব দিকের, সব অংশের এই বিস্তারিত ম্যাপ তৈরি করেছিলেন

রাজসভার একজন ভূ-বিজ্ঞানী। মনে করা হচ্ছে, দুষ্কৃতিকারীরাই এই ম্যাপ নিয়ে গেছে।

কিন্তু একটা পুরানো ম্যাপের জন্য এতবড় রক্তাক্ত ও দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালিত হওয়ায় সচেতন মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে।'

আহমদ মুসা রিপোর্টটি কয়েকবার পড়ল। তার নিশ্চিত মনে হলো, ভ্যান পুরাতত্ত্ব মিউজিয়ামের এই ডাকাতির সাথে উল্কিওয়ালা অর্থাৎ ড. আজদাদের প্রতিপক্ষ যারা, তাদের যোগ আছে। সব বাদ দিয়ে মাউন্ট আরারাতের মানচিত্র হারাবার কারণ এটাই। কিন্তু মানচিত্রটিতে কি ছিল? কেন তা এত মূল্যবান হলো? এ বিস্ময় আহমদ মুসার মনে সৃষ্টি হলো।

আর এই ডাকাতির সাথে ড. মাহজুন মাজহারের যোগ আছে বলে তার মনেই হলো না। ড. মাহজুন মাজহারের চেহারা দেখেই তার মনে হয়েছে, তিনি নির্দোষ। আর নিউজে তার অপরাধী হওয়ার যে ভিত্তির কথা বলা হয়েছে, তাও খুব ঠুনকো। অনুসন্ধান তো পরের কথা, সাধারণ যুক্তিতেই তা টিকবে না।

ভাবনাতেই আপনা-আপনি আহমদ মুসার চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পায়ের শব্দে চোখ খুলল আহমদ মুসা। দেখল, সাহিবা সাবিত আসছে।

সাহিবা সাবিতের হাসি-খুশি চেহারা গভীর উদ্বেগে ভরা। মুখ শুকনো। শুকনো কণ্ঠে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'স্যার, আপনি কি ক্লান্ত? আপনার চোখ বুজে আসছে দেখলাম।'

'না মিস সাহিবা সাবিত, ঘুমাচ্ছিলাম না, ভাবছিলাম।' আহমদ মুসা বলল।

'কি ভাবছিলেন এত গভীরভাবে?' জিজ্ঞাসা সাহিবা সাবিতের।

'ভাবছিলাম মিউজিয়ামে ডাকাতির ঘটনা নিয়েই।' আহমদ মুসা বলল।

'দেখলেন তো ব্যাপারটা কি সাংঘাতিক! আর বাবাকে দায়ী করা হয়েছে কিভাবে? সূর্য পূর্বে না উঠে, পশ্চিমে উঠা সত্য ভাবতে পারি, কিন্তু ঘটনার সাথে বাবা বিন্দুমাত্র জড়িত আছেন তা বিশ্বাস করবো না। কিন্তু পুলিশকে এ কথা বিশ্বাস করাবে কে?'

বলে একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, 'স্যার, পুলিশের বড় কর্তা এসেছেন। আব্বাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। আপনি কি যাবেন ওখানে?'

'কে, কোন অফিসার এসেছেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'ভ্যানের পুলিশ প্রধান ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মাহির হারুন এসেছেন। তিনি পুলিশের পূর্ব তুরস্ক মানে আনাতোলিয়া জোনেরও প্রধান।' বলল সাহিবা সাবিত।

'চল যাই, দেখি ওনারা কি আলোচনা করছেন।'

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

'চলুন স্যার।' বলে হাঁটতে শুরু করল সাহিবা সাবিত।

নিচের তলার ড্রয়িং রুমে বসেছিল ভ্যানের পুলিশ প্রধান ডিজিপি মাহির হারুন।

একটি সোফায় বসেছিল মাহির হারুন। তার সামনের সোফায় সাহিবা সাবিতের বাবা ড. মাহজুন মাজহার বসেছিল। আরও দু'জন পুলিশ ডিজিপি মাহির হারুনের পেছনের সোফায় বসেছিল।

ড. মাহজুন মাজহারের ডানপাশের আড়াআড়ি সোফায় বসেছে ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা আয়েশা।

সাহিবা সাবিত পিতার পাশেই বসেছিল। সেখান থেকেই সে উঠে গিয়েছিল আহমদ মুসার কাছে।

দোতলা থেকে নামার সিঁড়ির গোড়াতেই বিশাল একটা লাউঞ্জ। সেটাই বাড়ির অতিথি ড্রইং রুম। এখানেই বসেছে পুলিশ এবং ড. মাহজুন মাজহাররা।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামছিল আহমদ মুসা ও সাহিবা সাবিত।

সাহিবা সাবিত আগে ছিল। আর আহমদ মুসা নামছিল তার পিছে পিছে।

ভ্যান পুলিশের ডিজিপি মাহির হারুনের সোফাটা ছিল সিঁড়িমুখী।

পায়ের শব্দেই সম্ভবত ডিজিপি মাহির হারুন মুখ তুলে তাকাল সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির ওপর তার চোখ পড়তেই চোখটি যেন চলে গেল আহমদ মুসার ওপর। সম্ভবত আহমদ মুসাকে পরিপূর্ণভাবে দেখা শেষ হতেই এক অপার

বিস্ময়ে ছেয়ে গেল তার মুখ। ধীরে ধীরে বিস্ময়ের বদলে তার চোখে-মুখে নেমে এল সমীহ এবং দেহে একটা জড়সড় ভাব।

আহমদ মুসা সিঁড়ি থেকে ফ্লোরে নেমে এসেছে।

ডিজিপি মাহির হারুন এবং ড. মাহজুন মাজহারের কাছাকাছি এসে গেছে আহমদ মুসা।

ডিজিপি মাহির হারুন অনেকটা সম্মোহিতের মত উঠে দাঁড়িয়েছে। অজান্তেই যেন পা ঠুকে স্যালুট দিল আহমদ মুসাকে। তার চোখে ভেসে উঠেছে, জেনারেল মোস্তফার মত তুরস্কের ডাকসাইটে সিকিউরিটি চীফ এবং নাজিম এরকেনের মত তুরস্কের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও রাশভারী পুলিশ প্রধানের কথা। এই মি. খালেদ খাকানের ব্যক্তিত্বের কাছে তারা যেভাবে নরম হয়ে পড়েছে এবং সব ব্যাপারে তাকে যেভাবে সমীহ করেছে, তাতে মি. খালেদ খাকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্যে কঠিন।

স্যালুট দেয়ার পর ডিজিপি মাহির হারুন বলল, 'স্যার, আপনি এখানে!'

আহমদ মুসা ডিজিপি মাহির হারুনের সাথে হ্যান্ডশেইকের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয় ডিজিপি মাহির হারুন। কিন্তু আপনি কি আমাকে চেনেন? আমার তো তেমন কিছু মনে পড়ছে না?'

ডিজিপি মাহির হারুন একটু মাথা নুইয়ে হ্যান্ডশেইক করে বলল, 'স্যার, আপনি আমাকে চিনবেন না। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি।'

'কিভাবে?' আহমদ মুসা বলল। কিছুটা বিস্মিত হয়েছে সে। আহমদ মুসা তো তুরস্কের এ অঞ্চলে কখনো আসেনি।

'স্যার, আমি ইস্তাম্বুলে গিয়েছিলাম তুরস্কের সিকিউরিটি প্রধান জেনারেল মোস্তফা কামালের সাথে দেখা করার জন্য। তিনি তখন ওখানেই ছিলেন। সেখানে জেনারেল মোস্তফার সাথে আপনাকে প্রথম দেখি। দ্বিতীয়বার দেখি আপনাকে আমাদের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। আমি আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসারের সাথে আমাদের স্যার তুরস্কের পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনকে আপনাকে নিয়ে তার অফিসে ঢুকতে দেখেছিলাম। তৃতীয়বার দেখেছি আপনাকে প্রেসিডেন্ট ভবনে। তখন অফিসের এক কাজে আংকারা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গিয়েছিলাম

আমি। প্রেসিডেন্ট আপনাকে বিদায় সংবর্ধনা দেয়ার অনুষ্ঠান করছিলেন। সেসময় প্রেসিডেন্ট হাউজের লনে অন্য অনেকের সাথে আমিও ছিলাম।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'ধন্যবাদ অফিসার।' আহমদ মুসা বলল। সেই সাথে ভাবল, ডিজিপি মাহির হারুন এ কথা না বললেই ভালো হতো। কথাগুলো হাটে হাঁড়ি ভাঙার মত হয়েছে, যা এই পর্যায়ে আহমদ মুসার কাম্য ছিল না।

'এক্সকিউজ মি স্যার। আপনি তো বিশেষ বিমানে সেদিন ম্যাডামসহ মদিনায় ফিরে গেলেন। কিন্তু ভ্যানে কিভাবে এলেন আপনি?' বলল ডিজিপি মাহর হারুন।

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'ম্যাডাম মদিনা গেছেন আর আমি ভ্যানে নেমেছি।'

বলে আহমদ মুসা ড. আজদা আয়েশাকে দেখিয়ে বলল, 'ওর একটা আহ্বানে আমি এখানে এসেছি।'

'ওয়েলকাম স্যার। আমাদের 'ভ্যান' ও আরারাত অঞ্চল সৌভাগ্যবান আপনাকে পেয়ে। আতিথ্য করার সুযোগ পেলে আমি ধন্য হবো স্যার।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'ধন্যবাদ অফিসার।'

বলে আহমদ মুসা একটা সিংগল সোফা পেছন থেকে টেনে নিয়ে বসতে যাচ্ছিল।

ডিজিপি মাহির হারুন তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়িয়ে নিজের আসনে আহমদ মুসাকে বসতে আহ্বান জানিয়ে আহমদ মুসার হাত থেকে সোফাটি নিয়ে নিল।

আহমদ মুসা গিয়ে ডিজিপি'র সোফায় বসলে মাহির হারুন আহমদ মুসার পাশে এসে বসল।

সাহিবা সাবিত, ড. মাহজুন মাজহার, ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা সকলের মুখ বলা যায় বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছিল। ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার ডিজিপি হারুন তাদের আবু আহমদ আবদুল্লাহকে 'স্যার' বলছেন! তাকে স্যালুট করছেন! তাকে চেয়ার ছেড়ে দিচ্ছেন! তাদের আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে

প্রেসিডেন্ট বিদায় সংবর্ধনা দিয়েছেন! তুরস্কের পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন ও তুরস্কের সিকিউরিটি সার্ভিসের প্রধান জেনারেল মোস্তফা তাদের আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে বৈঠক করেন একান্তে! একি তারা শুনল! তাদের আবু আহমদ আব্দুল্লাহর নাম খালেদ খাকান! সব বিস্ময়ের সম্মিলিত ভারে তারা হতবাক, হতভম্ব। আহমদ মুসাকে চেয়ার দেয়ার কথাও তার ভুলে গেছে।

'স্যার. আপনি ভ্যানে এসেছেন জানলাম, কিন্তু হঠাৎ এখানে?' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'আমি আরিয়াস থেকে ভ্যানে এসেছিলাম একটা কাজে। ড. মাহজুনরা ড. আজদাদের বন্ধু পরিবার। ড. মাহজুন মাজহারদের এই বিপদের কথা শুনে ড. আজদা, ড. সাহাব নুরী এসেছেন। আমিও তাদের সাথে এসেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার, আমার জন্যে এক বিরাট সমস্যা। ড. মাহজুন মাজহার সম্মানিত পরিবারের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। ভ্যান মিউজিয়ামের ভয়ানক ঘটনার দায় এড়াতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের কোন যুক্তি তার কাছেও নেই দেখলাম। এই অবস্থায় আইনের দাবি তো আমাকে পূরণ করতেই হবে। এটা আমার জন্যে এক উভয় সংকট স্যার।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

আহমদ মুসা ও ডিজিপি মাহির হারুনের কথা সবাই দারুণ আগ্রহে শুনছিল। ডিজিপি মাহির হারুনের শেষ বক্তব্যটা শুনে সাহিবা সাবিত ও ড. আজদাদের মুখ যেন অমাবস্যার অন্ধকারে ছেয়ে গেল। ডিজিপি মাহির হারুনের কথার অর্থ কি তারা বোঝে। আহমদ মুসার নতুন পরিচয় এবং ডিজিপির সাথে তার সম্পর্ক দেখে তারা যতখানি খুশি হয়ে উঠেছিল, ততখানিই তারা আবার হতাশায় ডুবে গেল।

ডিজিপির কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠল। বলল ডিজিপি মাহির হারুনকে, 'এ বিষয়ে আমি আপনার সাথে পরে কথা বলছি। আপনি একটু বলুন, দুষ্কৃতিকারীদের যে লোকটি মারা গেছে, তার লাশ কোথায়?'

'সুরতহাল রিপোর্টের পরপরই লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।' ডিজিপি বলল।

‘লাশটি এখন কোথায় খোঁজ নিয়ে একটু জানবেন? লাশের একটা বিষয় সম্পর্কে আমার জরুরি জানা দরকার।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বিষয়টা কি বলুন। জানার জন্যে চেষ্টা করে দেখি।’ ডিজিপি বলল।

‘লাশের দুই বাহু দেখতে বলুন তাতে কোন উল্কি আঁকা আছে কিনা। থাকলে উল্কিটা কিসের?’ বলল আহমদ মুসা।

ডিজিপি মাহির হারুন তার মোবাইল বের করে কল করল সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারকে। কানেকশন হয়ে গেলে ডিজিপি বিষয়টি অফিসারকে বুঝিয়ে বলে নির্দেশ দিল, ‘বিষয়টি জেনে অবিলম্বে আমাকে জানাও।’

মোবাইল অফ করে পেছনে বসা পুলিশ অফিসারদের কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে আহমদ মুসার দিকে ঘুরতেই ডিজিপি মাহির হারুনের মোবাইল আবার বেজে উঠল।

কল অন করে ওপারের কথা শুনে বলল, ‘তুমি নিশ্চিত তো?’

ওপারের জবাব শুনে ‘থ্যাংক ইউ অফিসার’ বলে কল অফ করে দিল। তার মুখটা সাফল্যে উজ্জ্বল।

ডিজিপি আহমদ মুসার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, ‘স্যার, আপনি যা চাচ্ছিলেন, তা পাওয়া গেছে। লাশের ডান বাহুতে উল্কি আছে, মাউন্ট আরারাতের সিম্বলিক উল্কি।’

‘ধন্যবাদ অফিসার, আমি এটাই আশা করছিলাম। এই একই গ্রুপ ভ্যান মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশনে ঢুকেছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, আমি বুঝতে পারছি না এরা কোন গ্রুপ?’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘আমিও জানি না। আমি এটা বের করার চেষ্টা করছি। তবে উল্কিটাই এদের আইডেনটিফাইং মার্ক। এই গ্রুপই ড. আজদাকে এ পর্যন্ত একবার কিডন্যাপ ও দু’বার হত্যার চেষ্টা করেছে। এ খবর পত্রিকাতেও এসেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘জ্বি স্যার, এ রক্তাক্ত ভয়ানক ঘটনার খবর আমি পত্রিকায় পড়েছি।’

বলে একটু থামল ডিজিপি হারুন। পরক্ষণেই আবার বলে উঠল, 'স্যার, আজদাকে বারবার আক্রমণ করা এবং মিউজিয়ামের আরারাত সেকশনে হানা দেয়া সন্ত্রাসীরা একই গ্রুপ, কিন্তু লক্ষ্যের সাজুয্য কোথায়? এরা কি চায়?'

'অফিসার, এটাই এখনকার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এর সাথে সহযোগী প্রশ্নগুলো হলো, এরা মাউন্ট আরারাতের উল্কি বাহুতে লাগায় কেন? এরা মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশনে হানা দিয়ে মাউন্ট আরারাতের একটা পুরানো মানচিত্র নিয়ে গেল কেন? তারা আরিয়াসসহ ইজডির অ্যাগ্রি, কারস, ভ্যান বিশেষ করে মাউন্ট আরারাত সন্নিহিত ইজডির এলাকা থেকে অত্যন্ত নীরবে বিশেষ ধরনের লোকদের জেল-জুলুমের শিকার বানিয়ে এলাকা ছাড়া করে এবং সে স্থানে বিশেষ শ্রেণীর লোকদের বসানো হচ্ছে কেন? সব প্রশ্নেরই জবাব প্রয়োজন।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হলেও কথা সরলো না ডিজিপি মাহির হারুনের মুখ থেকে। তার বিস্ময় দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে, মাত্র ক'দিন হলো আহমদ মুসা এসেছে, এর মধ্যেই ভয়ানক ধরনের এত কথা জানল কি করে, যা সে এই অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক পুলিশ অফিসার হয়েও জানে না! বলল সে একটু সময় নিয়ে, 'স্যার, মাত্র কয়েকটা বাক্যে আপনি এই অঞ্চলের একটা ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরেছেন। দুঃখিত স্যার, এভাবে আমি বিষয়টাকে জানি না। একটা ঝামেলা এই এলাকায় হচ্ছে, ড্রাগ সমস্যা হঠাৎ করেই যেন এই এলাকায় বেড়ে গেছে। পুলিশ এ সংক্রান্ত সব ঘটনাকেই সিরিয়াসলি দেখছে। কিন্তু এ সবের পেছনে কোন গভীর অর্থ বা গভীর ষড়যন্ত্র আছে কিনা তা আমার সামনে নেই, পুলিশ অবশ্যই জানে না। তবে স্যার, আপনি যখন বলছেন, তখন এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর উচ্ছেদ হওয়া এবং বিশেষ এক শ্রেণীর পুনর্বাসিত হওয়ার যে কথা বলেছেন, তার পেছনের উদ্দেশ্য কি?'

'এই উদ্দেশ্য অনুসন্ধানের বিষয়।' বলল আহমদ মুসা।

'এ নিয়ে আপনি কি ভাবছেন স্যার? আমার মনে হয়, আপনি বিষয়টিকে টেকআপ করেছেন।' ডিজিপি মাহির হারুন বলল।

‘আমি আপনাদের সাহায্য করতে চাই। বিষয়টি নিয়ে আমি এখনও খুব চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাইনি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, আপনি বিষয়টি দেখুন। আমরা আপনাকে সহযোগিতা করব।’

‘ধন্যবাদ অফিসার। এ নিয়ে আপনার সাথে পরে কথা বলব। এখন বলুন, ভ্যান মিউজিয়ামে হানা দেয়া সম্পর্কে। ড. মাহজুন মাজহারকে আপনাদের দোষী মনে হচ্ছে কেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যার, দোষী মনে করা হচ্ছে না, দোষী হয়ে পড়ছেন। তার অফিস কক্ষে ঢুকেই এ্যালার্ম নেটওয়ার্ক ও ক্লোজ সার্কিট নেটওয়ার্ক নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। আর তার অফিস কক্ষের এবং মিউজিয়ামের আরারাত সেকশনে প্রবেশের ডিজিটাল লকের কোড একমাত্র তিনিই জানেন। অতএব দায়গুলো তার ওপরই বর্তাচ্ছে।’ ডিজিপি মাহির হারুন বলল।

আহমদ মুসার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল ড. মাহজুন মাজহারের দিকে চেয়ে, ‘স্যার, আপনাদের মিউজিয়ামের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা মিউজিয়ামের কতটা কভার করে?’

‘মিউজিয়ামের সবটা কভার করে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। এমনকি কম্পাউন্ডের ভেতর যে কয়জন স্টাফ বাস করেন, তাদের এলাকাও ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার চোখের আওতায় রয়েছে।’ বলল ড. মাহজুন মাজহার।

‘ধন্যবাদ, আপনার অফিস কক্ষ ও মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশনের বাইরের দরজা এলাকা এবং ভেতরের অবস্থান কি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার চোখে রয়েছে?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘জ্বি, সবটাই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আওতায়।’ বলল ড. মাহজুন মাজহার।

‘ধন্যবাদ স্যার’ বলে আহমদ মুসা তাকাল ডিজিপি মাহির হারুনের দিকে। বলল, ‘আমি বলছি, শুনুন প্লিজ। ভ্যান মিউজিয়ামের রেক্টর ড. মাহজুন মাজহার প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে তার তর্জনী দিয়ে ডিজিটাল কী’তে নক করে দরজা খোলেন এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে একইভাবে ডিজিটাল লকের কী’তে তর্জনী দিয়ে নক করে দরজা বন্ধ করেন। প্রতিদিনই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার

চোখ নিখুঁতভাবে প্রত্যক্ষ করে এবং সে নিখুঁত ছবিটি পাঠিয়ে দেয় সিকিউরিটি কক্ষের স্ক্রীনে। যারা সেখানে বসেন, তারা এটা প্রত্যক্ষ করেন এবং ছবিগুলো সিরিয়াসলি সংরক্ষিত হয় ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আর্কাইভ ফাইলে। সিকিউরিটি রুমে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ডিসপ্লে স্ক্রীন যারা দেখেন, তারা ইচ্ছা করলে ড. মাহজুন মাজহার তর্জনী দিয়ে অফিস কক্ষ ও মাউন্ট আরারাত সেকশনের ডিজিটাল লকের যে নব বা কীগুলোতে নক করেন, তা মুখস্থ করে ফেলতে পারে। আবার প্রতিদিনের যে ছবিগুলো ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আর্কাইভে জমা হয়, তা থেকেও ইচ্ছা করলে কেউ সংশ্লিষ্ট ছবিগুলো সংগ্রহের মাধ্যমে ড. মাহজুন মাজহারের অফিস কক্ষ ও মাউন্ট আরারাত সেকশনের ডিজিটাল লকের ওপেনিং ও ক্লোজিং কোড নাম্বার করায়ত্ত্ব করতে পারে। যারা পরিকল্পনা করে ভ্যান মিউজিয়ামে রক্তাক্ত হানা দেয়ার কাজ করেছে, তারা এই দুই উৎস থেকে ডিজিটাল লক দু'টোর ওপেনিং ও ক্লোজিং কোড নাম্বার জোগাড় করতে অবশ্যই পারে। সিকিউরিটি সিস্টেমে এই লুক হোলস থাকার পর ড. মাহজুন মাজহারকে দোষ দেবার কোন সুযোগ নেই।' থামল আহমদ মুসা।

ডিজিপি মাহির হারুন দুই চোখ ছানাবড়া করে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। তার মনে তোলপাড়। সত্যি তো, এ দিকটা তো তারা বিবেচনা করে দেখেনি। ডিজিটাল লক দু'টির সিক্রেট কোড এই দুই পথে ফাঁস হওয়া যতটা সহজ, ড. মাহজুন মাজহারকে দোষী বানানো ততটাই কঠিন। তার মন খুশি হয়ে গেল। সে বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি চিন্তার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ খুলে দিয়েছেন। সত্যি বলেছেন, সিকিউরিটি সিস্টেমে এই লুক হোলস থাকার পর ড. মাহজুন মাজহারকে কিছুতেই দায়ী করার সুযোগ নেই।'

বলেই ডিজিপি মাহির হারুন পেছন ফিরে ভ্যান শহরের ডাইরেক্টর অব পুলিশ (ডিপি) আফেনদি আফেটকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি ভ্যান মিউজিয়ামের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মনিটরিং কক্ষসহ গোটা সিকিউরিটি অফিসে গত ছয় মাসে সিভিলিয়ান যারা প্রবেশ করেছেন, তার সব ফিল্ম সিজ করো। আর ক্লোজ সার্কিট নেটওয়ার্কের ফিল্ম আর্কাইভও তুমি বাজেয়াপ্ত করো। তারপর সিরিয়াসলি

পরীক্ষা করে দেখ, কোন অংশ খোয়া গেছে কিনা, খোয়া গেলে খোয়া যাওয়া অংশটা কি?’

কথা শেষ করে ঘুরে বসল ডিজিপি মাহির হারুন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে ড. মাহজুন মাজহারকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আমাদের মাফ করুন স্যার। আপনাকে এভাবে হয়রানি করার জন্যে দুঃখিত আমরা। এই সাথে আমরা শুকরিয়া আদায় করছি আমাদের সম্মানিত অতিথি খালেদ খাকানকে। তিনি আমাদের যে সহযোগিতা করেছেন তা অমূল্য। আর তিনি শুধু আমাদের কেন, সমগ্র তুরস্কের সম্মানিত বন্ধু। খোদ আমাদের প্রেসিডেন্ট তাকে অভিনন্দিত ও সম্মানিত করেছেন। আমরা আনন্দিত যে, আল্লাহ তাকে এখানে এনেছেন। আমাদের আশা, তার সবরকম সাহায্য-সহযোগিতা আমরা পাব।’ থামল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘ধন্যবাদ অফিসার, এটা কোন হয়রানি নয়। আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। রক্তাক্ত ও রহস্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে আমার প্রতিষ্ঠানে। আপনারা যা করেছেন, করছেন সবই আমাদের প্রতিষ্ঠান ও দেশকে সাহায্যের জন্যেই। আমার সম্মানিত অতিথি আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে ধন্যবাদ দেবার কোন ভাষা আমার জানা নেই। প্রেসিডেন্ট যাকে অভিনন্দিত করেন, যার প্রশংসা করেন, তার ব্যাপারে আমি আর কি বলব। তিনি আমাকে বিস্মিত, অভিভূত করেছেন। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদাকে। তারাই এই সম্মানিত মেহমানকে এখানে এনেছিলেন। আমি মনে করি, এই রক্তাক্ত ঘটনার ব্যাপারে তার যে দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখলাম, তাতে আমি নই, পুরো দেশই উপকৃত হবে। আল্লাহ তাকে এবং আমাদের সবাইকে সাহায্য করুন।’ থামল ড. মাহজুন মাজহার।

ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদার চোখে-মুখে গর্ব ও আনন্দের মিশ্রণ। আর তরুণী সাহিবা সাবিতের সুন্দর মুখ অপার মুগ্ধতায় আরও অপরুপ হয়ে উঠেছে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা তার মুগ্ধ দৃষ্টি থেকে শ্রদ্ধা, সম্মানের যেন বন্যা ছুটছে আহমদ মুসার প্রতি। উজাড় করে দিচ্ছে যেন তার হৃদয়কে। নির্বাক সে।

‘দুঃখিত, ঘটনা যা নয় তা বলা সুবিচার নয়, বিব্রতকর। আমি যদি উল্লেখযোগ্য কিছু করে থাকি, বলে থাকি, তার সব কৃতিত্বই আল্লাহর, আমার স্রষ্টার। আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, শক্তি যাকে আমাদের বলি, তা আমাদের নয়, আল্লাহর দেয়া। সুতরাং প্রশংসা আমাদের তাঁরই করা উচিত।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ স্যার, এটাও আমাদের জন্যে বড় শিক্ষা। মনে রাখব স্যার। আমরা উঠি।’

বলে উঠে দাঁড়াল ডিজিপি মাহির হারুন।

তারপর আহমদ মুসার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হ্যান্ডশেইক করতে করতে বলল, ‘স্যার, আমার অফিসে, আমার বাড়িতে আপনাকে ওয়েলকাম। আর আপনার সাথে যোগাযোগ রাখার অনুমতি দিন স্যার।’

‘ধন্যবাদ অফিসার! ড. আজদার কাছে আমার টেলিফোন নাম্বার পাবেন। আর আমার চেয়ে আপনাকেই আমার বেশি দরকার হতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সে হবে আমার সৌভাগ্য স্যার।’ বলে সালাম দিয়ে ডিজিপি মাহির হারুন ঘুরে দাঁড়াল যাবার জন্যে।

ড. আজদা তাড়াতাড়ি উঠে এসে আহমদ মুসার টেলিফোন নাম্বার লেখা একটা স্লীপ ডিজিপি মাহির হারুনের হাতে তুলে দিল।

ধন্যবাদ ড. আজদা।’ কাগজটি হাতে নিয়ে বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

পুলিশ অফিসাররা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

‘সাহাব, আজদা তোমাদের নাস্তা করা হয়নি নিশ্চয়? তোমরা তো খুব সকালে বেরিয়েছ।’ পুলিশ অফিসাররা বেরিয়ে যেতেই বলল ড. মাহজুন মাজহার।

‘ঠিক, নাস্তার কথা আমাদের খেয়ালই হয়নি। তবে এ নিয়ে ব্যস্ত হবেন না।’ বলল ড. সাহাব নুরী সপ্রতিভ কণ্ঠে।

‘আমরাও নাস্তা করিনি। ঠিক আছে, চল ওপরে যাই।’ বলল ড. মাহজুন মাজহার।

‘নাস্তা তৈরি হচ্ছে বাবা। আমি একবার ওপরে গিয়ে দেখে এসেছি।’ বলল সাহিবা সাবিত।

আহমদ মুসা বলল, ‘নাস্তার তুর্কি সময় এখনও হয়নি। ৯টা বাজতে এখনও অনেক সময় বাকি। আমি কাগজ পড়া শেষ করতে পারিনি।’

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ড. মাহজুন মাজহার বলল, ‘হ্যাঁ, ঠিক তাই। ৯টা বাজতে এখনও আধা ঘণ্টা বাকি।’

থামল একটু, আবার বল সাহিবা সাবিতের দিকে তাকিয়ে, ‘মা, ওকে স্টাডিতে নিয়ে যাও। আমরা আসছি। একসাথে নাস্তা করব।’

সাহিবা সাবিত খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে কয়েক ধাপ আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে বলল, ‘স্যার, আসুন।’

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

দু’জন এগোতে শুরু করেছে দু’তলায় উঠার সিঁড়ির দিকে।

ড. আজদা ডাকল সাহিবা সাবিতকে।

‘এক্সকিউজ মি!’ বলে ছুটে এল সাহিবা সাবিত ড. আজদার কাছে। ড. আজদা তাকে কানে কানে কিছু বলল, ‘রাঙা’ হয়ে গেল সাহিবা সাবিতের মুখ। ‘ওকে!’ বলে ছুটেই আবার ফিরে গেল আহমদ মুসার কাছে।

দু’জনে আবার হাঁটতে লাগল সিঁড়ির দিকে।

সামনে হাঁটছে সাহিবা সাবিত।

ঘাড় ফিরিয়ে সাহিবা সাবিত বলল, ‘স্যার, একটা কথা বলি?’

‘বলুন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বাঃ আবার আপনিতে উঠলাম! তখন স্টাডিতেই তো আমাকে তুমিতে নামিয়েছেন।’ বলল সাহিবা সাবিত। তার মুখে দুষ্টুমির হাসি।

‘বলেছি নাকি! ঠিক আছে, কি বলবে বল।’ নির্বিকার কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘আমি বলতে চাচ্ছি, বিশ্ববিখ্যাত চরিত্র ‘শার্লক হোমস’, ‘রবিনহুড’ যেমন তাদের আসল নাম নয়, তেমনি ‘আবু আহমদ আব্দুল্লাহ’ ও ‘খালেদ খাকান’ কোনটাই আপনার আসল নাম নয়!’ সাহিবা সাবিত বলল।

‘‘শার্লক হোমস’ ও ‘রবিনহুড’ সেই লোকদের আসল নাম ছিল কিনা আমি জানি না। কিন্তু আমাকে তোমার সন্দেহ হওয়ার কারণ?’ বলল আহমদ মুসা। তার চোখে কিছুটা বিস্ময়।

‘ডিজিপি সাহেব আপনার নাম বললেন খালেদ খাকান, আর আমাদের কাছে আপনার নাম আবু আহমদ আব্দুল্লাহ। তার মানে, তুরস্কের ওমাথা থেকে এমাথায় এসেই আপনি নাম পাল্টেছেন তাহলে ওমাথাতেও আপনি নাম পাল্টেছেন?’ সাহিবা সাবিত বলল।

‘চমৎকার যুক্তি দিয়েছ সাহিবা সাবিত। তোমার ওকালতি পড়া দরকার ছিল।’ বলল আহমদ মুসা। তার মুখে এবার স্পষ্ট হাসি।

‘কথা অন্য দিকে ঘোরাবেন না প্লিজ স্যার, আমার কথার জবাব দিন।’ সাহিবা সাবিত বলল।

‘তুমি একটা জটিল প্রশ্ন করেছ। প্রশ্নটির উত্তর দেয়া এখন সম্ভব নয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘জটিল প্রশ্ন? আসল নাম বলা জটিল হবে কেন? আমি এ যুক্তি মানছি না।’ সাহিবা সাবিত বলল। হালকা জেদ ফুটে উঠল সাহিবা সাবিতের কণ্ঠে।

‘জটিলতা আছে। অনেক সময় নানা কারণে নাম গোপন করতে হয়। মানে এটা তেমনই একটা সময়।’ বলল আহমদ মুসা। গম্ভীর কণ্ঠ তার।

সাহিবা সাবিত পেছন দিকে ফিরে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। আহমদ মুসাকে বোঝার চেষ্টা করছে যেন।

‘ঠিক আছে, এই সময়ের জন্যে মানলাম, সব সময়ের জন্যে নয়।’ সাহিবা সাবিত বলল। তার মুখে হাসি।

তারা স্টাডি রুমে পৌঁছে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা তার আগের চেয়ারেই বসল।

‘স্যার, আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।’ বলে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে সাহিবা সাবিত।

আহমদ মুসা ‘ভ্যান টাইম’ আগেই পড়েছিল। এবার ভ্যানের আরেকটি বড় পত্রিকা ‘ভ্যান-এক্সপ্লোরার’ টেনে নিয়ে তাতে মনোযোগ দিল।

একসময় ঘরে পায়ের শব্দে মুখ তুলল আহমদ মুসা। দেখল সাহিবা সাবিতকে নতুন রূপে। পরনে হালকা সবুজ সালওয়ার এবং সেই হালকা সবুজ ফুলহাতা কামিজ। একই রঙের ওড়না মাথা ও গায়ে পেঁচানো। নতুন পোশাকের ওপর আহমদ মুসার চোখ আটকে গিয়েছিল।

'স্যার কেমন লাগছে বলুন।' মুখ ভরা হাসি নিয়ে বলল সাহিবা সাবিত।

'একজন মুসলিম মেয়ের মত লাগছে।' বলল আহমদ মুসা গম্ভীর কণ্ঠে।

'তার মানে, আগে আমি মুসলিম মেয়ে ছিলাম না?' বলল সাহিবা সাবিত প্রতিবাদের কণ্ঠে।

'তুমি মুসলিম ছিলে, কিন্তু মুসলিমের মেয়ে ছিলে না।' আহমদ মুসা বলল।

'ইসলামের কি কোন কম্পালসারি ড্রেসকোড আছে?' জিজ্ঞাসা সাহিবা সাবিতের। সে আহমদ মুসার মুখোমুখি এসে বসেছে।

''ড্রেস কোড' বলতে অনেকটা ইউনিফর্ম ড্রেস বোঝায়। সে রকম কোন ড্রেস কোড ইসলামে নেই। ইসলাম একটা প্রিন্সিপাল বলে দিয়েছে। বলেছে, মেয়েদের তাদের সৌন্দর্যের স্থানগুলোকে ঢেকে রাখতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

সাহিবা সাবিতের মুখটা একটু রাঙা হয়ে উঠল। একটু ভাবল। বলল, 'এই হুকুম ছেলেদের ওপর নেই কেন?'

'ছেলেদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে। তাদের পোশাক হাঁটুর ওপরে উঠতে পারবে না। তবে 'সৌন্দর্যের স্থানগুলো ঢাকতে হবে'-এই ধরনের নির্দেশ ছেলেদের ক্ষেত্রে নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'এই নির্দেশের কথাই আমি বলছি স্যার। এমন নির্দেশ মাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রে আসবে কেন?' বলল সাহিবা সাবিত।

'এর পক্ষে অনেক যুক্তি, অনেক কথা আছে। আমি মাত্র একটা সহজ যুক্তির কথা বলব সাহিবা।'

বলে একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, ‘সুন্দর ও মূল্যবান জিনিস আড়াল করতে হয় অন্যের নজর থেকে। কারণ, অন্যের লোভ অনর্থের সৃষ্টি করতে পারে। মেয়েরা বা মেয়েদের সৌন্দর্য তেমনি একটা বস্তু যা আড়াল করতে হয়।’

‘যুক্তিটা বুঝলাম স্যার। কিন্তু ছেলেদের সৌন্দর্য আড়াল করতে হবে না কেন? তা কি লোভের বস্তু নয়?’ বলল সাহিবা সাবিত।

‘তোমার প্রশ্ন খুবই সংগত সাহিবা সাবিত। কিন্তু সমস্যা হলো, পুরুষরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে, মেয়েরা তাদের রক্ষা করতে পারে না। আরেকটা বড় বিষয় হলো, মেয়েরা এই বিষয়ে পুরুষদের ওপর আক্রমণাত্মক নয়। অন্যান্য জীবজগতেও দেখবে, এটাই সত্য। প্রকৃতিগতভাবেই মেয়ে প্রজাতি এই ক্ষেত্রে নন-এ্যাগ্রেসিভ, সংরক্ষণবাদী। অন্যদিকে এক্ষেত্রে পুরুষরা একেবারেই উল্টো। নারীরা, নারীদের সৌন্দর্য পুরুষদের শুধু আক্রমণ নয়, ভায়োলেন্সেরও শিকার হয়। প্রাচীন, আধুনিক সব ইতিহাস এ ধরনের ঘটনায় ভরপুর। সুতরাং নারী ও নারীর সৌন্দর্য প্রয়োজন অনুযায়ী আড়াল করা তাদের এবং সমাজের জন্যে কল্যাণকর।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনার সব যুক্তি মানলাম স্যার। কিন্তু সব মানুষ খারাপ নয়, বরং বেশিরভাগই ভালো। ইতিহাস এরও সাক্ষী। তাহলে কিছু খারাপ লোকের কারণে মেয়েদের জন্যে এত আয়োজন করতে হবে কেন?’ সাহিবা সাবিত বলল।

‘নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এমন ভালো মানুষ অনেক আছে, আবার অনেকে আছে যারা সুযোগ ও সাহসের অভাবে ভালো থাকে, কিন্তু শয়তান যেহেতু আছে, শয়তানী প্রবণতা থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়। এই কারণেই আল্লাহ সাবধান হওয়ার বিধানকে সাধারণ করে দিয়েছেন। এ বিধানের যৌক্তিকতার আরেকটা দৃষ্টান্ত দেখ, চোর সমাজের ক’জন, অপরাধী সমাজের ক’জন, কিন্তু দেখ, সাধারণভাবে সবার জন্যে আইন তৈরি হয়েছে। আইন সবাইকেই পাহারা দেয়। মেয়েদের সৌন্দর্য আড়ালের ব্যাপারটাও এরকমই।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করল।

কিন্তু কোন কথা এল না সাহিবা সাবিতের কাছ থেকে। ভাবছিল সে। তার চঞ্চল চোখ দু’টিতে অনেক প্রশ্ন। বলল, ‘স্যার, আপনি যা আমাকে বললেন,

আমার ২৪ বছর বয়সে, আমার বাবা তা আমাকে বলেননি কেন? আমার বাবার মত লাখো বাবা তো এটা বলেন না! কেন বলেন না? জ্ঞান-শিক্ষায় তারা তো সমাজের শীর্ষে!'

'সাহিবা সাবিত, বিষয়টা বুঝতে সমাজ-সভ্যতার গভীরে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। সভ্যতা-সংস্কৃতির একটা চরিত্র আছে। যে জাতি রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যখন শীর্ষে পৌঁছে, তখন চারপাশে অন্যজাতির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তখন আধিপত্যের অধীন জাতিগুলোর জীবনে আধিপত্যকারীদের শিক্ষা-সংস্কৃতিই প্রভাবশীল হয়ে থাকে। সেটাই হয়েছে আমাদের জীবনে, মুসলিম দেশগুলোতে। এটা আধিপত্যবাদী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রবল স্রোত। এই স্রোতেই ভেসে যাচ্ছে সবাই। এককভাবে বাবাদের কোন দোষ নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'স্রোত আপনাকে ভাসাতে পারেনি কেন?' জিজ্ঞাসা সাহিবা সাবিতের।

'চাইনি বলে।' আহমদ মুসা বলল।

সাহিবা কিছু বলতে যাচ্ছিল। স্টাডিতে প্রবেশ করল ড. আজদা। বলল, 'নাস্তা রেডি। সবাই নাস্তার টেবিলে গেছে।'

'চলুন স্যার।' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সাহিবা সাবিত তাড়া দিল আহমদ মুসাকে।

নাস্তার টেবিলে সবাই বসল।

সাহিবা সাবিতের দিকে তাকিয়ে ড. মাহজুন মাজহার কিছুটা বিস্ময় নিয়ে বলল, 'সাহিবা সাবিত মা, জন্মের পর এই প্রথম তোমাকে এই পোশাকে দেখলাম। হঠাৎ এই পোশাক?'

'বাবা, আমি মুসলিম মেয়ে হয়েছি। দেড় দু'ঘন্টায় বাবা আমি স্যারের কাছে অনেক কিছু শিখেছি। আরও শিখতে চাই বাবা।' বলল সাহিবা সাবিত।

'ধন্যবাদ মা। আমি ও তোমার মা একসাথে তোমাকে নিয়ে এই ধরনের কয়েক সেট পোশাক তৈরি করে দিয়েছিলাম। বোধহয় পোশাকগুলো পরাই হয়নি।' বলল মাহজুন মাজহার।

‘হ্যাঁ, বাবা তখন পোশাক তৈরি হয়েছিল, কিন্তু মন তৈরি হয়নি।’ হেসে বলল সাহিবা সাবিত।

ড. মাহজুন মাজহারের ঠোঁটেও মিষ্টি হাসি। বলল, ‘মনটা তৈরি হলো কখন মা?’

‘আজদা কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলল, আমাদের মেহমান এ ধরনের পোশাক পছন্দ করেন না, আর এ পোশাক পরেই তুমি তার সামনে ঘুরছ। আমি ওকে নিয়ে ওপরে এলাম। এসেই পোশাক পাল্টে ফেললাম। কিন্তু মনটা পাল্টে দিয়েছেন উনি।’ বলল সাহিবা সাবিত। তার মুখে আবেগ-রাঙা হাসি।

‘পাল্টে দিয়েছেন? মন কি দু’এক মিনিটে পাল্টাবার জিনিস?’ বলল ড. আজদা। তার ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি। মনে হয় ঠোঁটের পেছনে যেন আরও কথা আছে।

‘কি বল আজদা! এক পলকের দেখা, একটা কথাতেও মনে ওলট-পালট ঘটে যেতে পারে।’ সাহিবা সাবিত বলল।

ড. আজদা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই ড. মাহজুন মাজহার বলল, ‘আলহামদুলিল্লাহ, এটাই হোক। মনে হচ্ছে, আমার মনের একটা অব্যক্ত চাওয়া যেন পূরণ হলো। এ চাওয়াটা আমার কাছেও যেন খুব স্পষ্ট ছিল না। আজ তোমাকে এই সুন্দর পোশাকে দেখে মনটা যখন আমার খুশিতে ভরে গেছে, তখন বুঝতে পারছি, আমার মন এটাই চাইতো।’

‘ধন্যবাদ বাবা।’ বলল সাহিবা সাবিত।

‘ধন্যবাদ আমাকে নয় মা, কৃতজ্ঞ হও আবু আহমদ আব্দুল্লাহর কাছে। উনি যেন এক পরশমণি। ওনার পরশে ঘটনা পাল্টে যায়, মানুষও পাল্টে যায়।’

আহমদ মুসার চোখে-মুখে অস্বস্তি। বলল, ‘গরম সুন্দর নাস্তা কিন্তু আমরা নষ্ট করে ফেলছি।’

‘স্যরি, ঠিক বলেছেন জনাব আব্দুল্লাহ। আসুন আমরা শুরু করি।’

বলেই প্লেট টেনে নিয়ে কাঁটা চামচ হাতে নিল ড. মাহজুন মাজহার।

সবাই নাস্তার দিকে মনোযোগ দিল।

নাস্তা শেষে সবাই কফি খাচ্ছে ড্রইং রুমে সোফায় ফিরে গিয়ে।

ড. আজদা চারদিকে চাইল। দেখল, সাহিবা সাবিত নেই। কফি তো নিল সে। কোথায় গেল কফি নিয়ে?

কফি হাতে নিয়েই খুঁজতে বেরুল সাহিবা সাবিতকে ড. আজদা।

সাহিবা সাবিতকে পেল ড. আজদা ড্রইং রুমের পাশের একটা ঘরে।

সাহিবা সাবিতের হাতে ক্যামেরা। কফিটা তার ঠাণ্ডা হচ্ছে ঘরের একটা টেবিলে।

'তোর হাতে এ সময়ে ক্যামেরা! ক্যামেরা নিয়ে কি করছিস?' ড. আজদা বলল।

'তোমাদের মেহমান, বাবার পরশমণির কয়েকটা ছবি নিলাম এই জানালা দিয়ে। প্লিজ, তুমি ওকে কিছু বলো না।' বলল সাহিবা সাবিত।

জানালার দিকে এগিয়ে ড. আজদা দেখল, সত্যিই জানালা দিয়ে আহমদ মুসাকে সম্মুখ থেকে দেখা যাচ্ছে।

ফিরে দাঁড়াল ড. আজদা সাহিবা সাবিতের দিকে। বিস্ময় তার চোখে। বলল, 'কি সাহিবা, পরশমণি স্পর্শ করে ফেলল নাকি!'

'বিদ্রূপ করো না আজদা। এই স্পর্শ আমার মত মেয়েদের সারা জীবনের চাওয়া হতে পারে।' বলল সাহিবা সাবিত। তার কণ্ঠ গম্ভীর, আবেগে ভারি।

ড. আজদা দু'ধাপ এগিয়ে সাহিবা সাবিতের কাঁধে হাত রেখে দরদভরা কণ্ঠে বলল, 'আমি বিদ্রূপ করিনি সাহিবা, আমার কথা তুমি বুঝেছ?'

সাহিবা সাবিত জড়িয়ে ধরল ড. আজদাকে। বলল, 'এসব কথা থাক। চল ড্রইংয়ে যাই। আমাদের আসাটা 'অড' হয়ে গেছে।'

ড. আজদা ও সাহিবা চলল ড্রইংয়ের দিকে।

বারবার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল ওরান্তি ওরারতু। তার চোখে-মুখে অধৈর্য ভাব। স্বাভাবিকভাবে কথা বলে গেলেও তার অস্থিরতা কারুরই নজর এড়াবার কথা নয়।

বিষয়টা লক্ষ্য করে মুখে হাসি টেনে মিহরান মুসেগ মাসিস নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, 'মি. ওরান্তি ওরারতু, এখন মাত্র ভোর পৌনে পাঁচটা। ওরা ভ্যান থেকে যাত্রা করেছে ৪টায়। রাস্তায় কয়েক জায়গায় চেকিং আছে। ওদের ইজডির এসে পৌঁছতে সোয়া ঘণ্টা লাগবেই। চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।'

ইজডির শহরটি আর্মেনিয়ার লাগোয়া তুর্কি প্রদেশ ইজডির-এর রাজধানী। মাউন্ট আরারাত পর্বতটি এ প্রদেশেই অবস্থিত। ইজডির শহরটি মাউন্ট আরারাত থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এখান থেকে আর্মেনিয়া সীমান্ত মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে।

মিহরান মুসেগ মাসিসের কথা শেষ হতেই ওরান্তি ওরারতু বলল, 'ওরা কখন আসবে এ নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। উদ্বিগ্ন আমি মাউন্ট আরারাতের ডকুমেন্ট নিয়ে। ডকুমেন্টটি কখন আমাদের হাতে পৌঁছবে, এ নিয়েই আমার অস্থিরতা। আপনি জানেন মি. মিহরান মাসিস, দুর্লভ এই মানচিত্রটি হাতে পাওয়া আমার কত বছরের সাধনা।'

ওরান্তি ওরারতু 'লাভার অব নোহা'স হোলি আর্ক' গ্রুপের প্রেসিডেন্ট। এই গ্রুপকে সংক্ষেপে 'হোলি আর্ক গ্রুপ' বলা হয়। সাধারণ মানুষের কাছে এরা পয়গম্বর নুহ-এর স্মৃতিধন্য মাউন্ট আরারাতের ভক্ত বলে পরিচিত। এদের কাছে 'মাউন্ট আরারাত' দেবতা, এই মাউন্ট আরারাতের প্রতি এদের এত ভক্তির আধিক্য, এটাই মানুষ জানে। এই জানার আড়ালে এই গ্রুপ আসলে একটি ভয়ংকর লোভী চক্র। লোভ থেকেই এই গ্রুপের জন্ম। একটা লোক-বিশ্বাসের এর

উত্তরসূরী। শত শত বছর ধরে বংশ-পরম্পরায় এক শ্রেণীর বিশেষ করে আরারাত আর্মেনীয় খৃস্টানদের মধ্যে এ বিশ্বাস চলে আসছে যে, হযরত নুহ আ.-এর নৌকায় টন টন স্বর্ণ ছিল। নুহ আ. –এর একজন ভক্ত অতি পুরাতন ধর্মালয়ের একজন সেবক এই টন টন স্বর্ণ নৌকায় তুলেছিল হাতির পিঠে করে। প্লাবন শেষ হবার পর সেই আবার স্বর্ণ নামিয়ে নিয়ে পাহাড়ের বড় গুহায় রেখেছিল সাময়িকভাবে। বোধহয় ভেবেছিল, সব ঠিক-ঠাক করে স্বর্ণের ভাণ্ডারকে আবার ঐ ধর্মশালায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু প্লাবনে ধর্মশালাটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়ায় সে স্বর্ণভাণ্ডারকে গুহা থেকে আর নিয়ে যায়নি। সে ভেবেছিল, স্বর্ণভাণ্ডার পবিত্র পর্বতের গুহায় থাকবে, এটাই বোধহয় আল্লাহর ইচ্ছা। সেই থেকে স্বর্ণের সেই অতুল ভাণ্ডার পর্বতের সেই গুহাতেই আছে। 'হোলি আর্ক গ্রুপ' সেই স্বর্ণেরই তালাশ করছে বহু বছর ধরে। কিন্তু গুহাটির সন্ধান তারা পায়নি। মাউন্ট আরারাতের দুই শৃঙ্গের মাঝখানে যেখানে নুহ আ.-এর নৌকা প্লাবনের পর ল্যান্ড করেছিল, তারই আশেপাশে কোন বড় গুহায় স্বর্ণভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু মাউন্ট আরারাতের বরফ প্রায় তিনশ' ফুটের মত গভীর হওয়ায় গুহা চিহ্নিত করা যেমন কঠিন, গুহাগুলোর ভেতরটা তালাশ করা আরও কঠিন। সবচেয়ে বড় যে মুশকিলে তারা পড়েছে সেটা হলো, ১৮৪০ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে পাহাড়ে বিরাট পরিবর্তন আসে এবং অনেক গুহা বন্ধ হয়ে যায়। স্বর্ণভাণ্ডারের গুহা অনুসন্ধানও কঠিন হয়ে যায়। প্রয়োজন পড়ে ভূমিকম্প-পূর্ব সময়ে পর্বতের গুহাগুলোর অবস্থান জানা। এই তথ্য লাভের জন্য 'হোলি আর্ক গ্রুপ' হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায়। অন্যদিকে মিহরান মুসেগ মাসিস 'সান অব হোলি আরারাত' (Son of Holy Ararat- SOHA) সম্প্রদায়ের প্রেসিডেন্ট। খুব প্রাচীন এই সম্প্রদায়। সময়ের পরিবর্তনে সম্প্রদায়ের নামটি অভিন্ন থাকলেও সম্প্রদায়টির প্রকৃতি পাল্টে গেছে। প্রাচীনকালে সম্প্রদায়টি ধর্মভীরু মানুষের প্রতিষ্ঠান ছিল। সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈষম্য চিন্তার বাইরে ছিল। মধ্যযুগে সোহা (SOHA) সম্প্রদায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো। তারা দাবি তুললো, মাউন্ট আরারাত আর্মেনিয়ার এবং আর্মেনিয়া মাউন্ট আরারাতের। তাদের কাছে মাউন্ট আরারাত দেবতা, সে দেবতার সৃষ্টি আর্মেনিয়া। তারা বলল, সৌভাগ্য দেবতা মাউন্ট

আরারাতকে বাদ দিয়ে আর্মেনিয়ার অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। এই সব কথা ও দাবি সামনে এনে 'সোহা' সম্প্রদায় হিংসাত্মক এক সন্ত্রাসী আন্দোলন শুরু করল, নুহ ও জেসাসের হোলি ল্যান্ড আর্মেনিয়া ও হোলি মাউন্ট আরারাতের জন্যে হত্যা-লুণ্ঠনকে তারা পুণ্য বলে মনে করল। তাদের এই হত্যা ও সন্ত্রাসের শিকার হলো তুর্কি মুসলিম জনসাধারণ। এরই অংশ হিসেবে 'সোহা'রা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য-সহযোগিতা করার ষড়যন্ত্র করে। এরই জবাবে তুরস্ক 'সোহা' নামের আর্মেনীয় তুর্কি নাগরিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একেই আর্মেনিয়া ও পশ্চিমী মিত্ররা আর্মেনীয় গণহত্যা নাম দিয়েছে। পরে আর্মেনীয় সরকার সোহাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়। এইভাবে 'সোহা'দের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু আধুনিককালে এসে 'হোলি আর্ক গ্রুপ'-এর উস্কানি এবং অঢেল অর্থ-সাহায্যে 'সোহা'রা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। উভয়ের স্বার্থ উদ্ধারে দুই গ্রুপের মধ্যে একটা আন-হোলি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সোহারা চায়, তুরস্কের ইজডির, কারস, অ্যাগ্রি ও ভ্যান প্রদেশসহ মাউন্ট আরারাতকে আর্মেনিয়ার সাথে এক করে ফেলতে। এতে মাউন্ট আরারাত আর্মেনিয়ার এবং আর্মেনিয়া মাউন্ট আরারাতের এই আবহমান লক্ষ্য তাদের হাসিল হবে। অন্যদিকে হোলি আর্ক গ্রুপ চাচ্ছে, নিরপদ্রবে, কোন বাঁধা-বিপত্তি, নজরদারি ছাড়া মাউন্ট আরারাতে স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধান করতে। গোটা এলাকা বিশেষ করে মাউন্ট আরারাত তুর্কি সৈন্যের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকায় স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মাউন্ট আরারাত আর্মেনিয়ার অংশ হলে এই অসুবিধা থাকবে না। তখন মাউন্ট আরারাতকে বৈঠকখানার মত ব্যবহার করা যাবে এবং মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভাণ্ডার হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

'মাউন্ট আরারাতের হাজারো মানচিত্র আছে। খুব বিস্তারিত, খুব সূক্ষ্ম মানচিত্রও রয়েছে। কিন্তু সব বাদ দিয়ে ঐ বিশেষ মানচিত্রটা কেন এত জরুরি মি. ওরান্তি ওরারতু?' বলল মিহরান মুসেগ মাসিস ওরান্তি ওরারতুর কথা শেষ হতেই।

‘আসলে ঐ মানচিত্রটা অদ্বিতীয় মি. মিহরান মাসিস। এক দুর্লভ মানচিত্র ওটা। বলা যায়, এক উলঙ্গ মানচিত্র ওটা মাউন্ট আরারাতের। খৃস্টপূর্ব ৫শ’ অব্দের এক দুর্লভ গ্রীষ্মকাল এসেছিল। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় খরাপীড়িত গ্রীষ্মকাল ছিল এটা। মাউন্ট আরারাতের ১৪০০০ ফুট-লেভেল থেকে ১৭০০০ ফুট পর্যন্ত সব সময় বরফে ঢাকা থাকে। কিন্তু সেই গ্রীষ্মকালে মাউন্ট আরারাতের বরফের লেভেল ১৬০০০ ফিট পর্যন্ত উঠে যায়। ইতিহাসে প্রথমবারের মত মাউন্ট আরারাতের ২০০০ ফুট এলাকার বরফ গলে নগ্ন হয়ে পড়ে। এরই সুযোগ নেন ওরান্তি রাজবংশের তৎকালীন রাজসভার শিল্প ও ভূ-তত্ত্ববিদ সভাসদ নাইরো নারিজিয়ান। ইতিহাসে প্রথমবারের মত নগ্ন হয়ে পড়া মাউন্ট আরারাতের ঐ অংশের (১৪০০০ থেকে ১৬০০০ ফিট) বিস্তারিত মানচিত্র আঁকেন তিনি। যাতে পর্বতের প্রতি ভাঁজ ও প্রতি গুহা শুধু নয়, বড় বড় পাথরের অবস্থানও সে মানচিত্রে চিহ্নিত হয়। আর আপনি জানেন, আমাদের পিতা নুহের নৌকা প্লাবন শেষে মাউন্ট আরারাতের ১৫ হাজার ৫শ’ ফিট উচ্চতায় এক গিরিভাঁজে ল্যান্ড করেছিল। এখানেই নৌকাটি এখনও আছে কোন গুহায় অথবা পাহাড়ের কোন ধ্বংসস্তুপের আড়ালে। ৫শ’ খৃস্টপূর্ব অব্দে কিন্তু সব গুহা ও পর্বতের ভাঁজ সবই অক্ষত ছিল। সুতরাং নারিজিয়ানের ঐ মানচিত্রে নুহের নৌকা এবং আশেপাশের সব গুহাসহ সব গুহার অবস্থান জানা যাবে। আর এটা নিশ্চিত, নৌকার আশেপাশের কোন নিরাপদ গুহাতেই স্বর্ণভাণ্ডার সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। মানচিত্রটি পেলে এই সব গুহার লোকেশন হিসেব-নিকেশ করে বের করে নেয়া যাবে। এখানেই মানচিত্রটির গুরুত্ব মি. মিহরান মাসিস।’

দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল ওরান্তি ওরারতু।

‘আপনার কথাগুলো রূপকথার মত মনে হচ্ছে।’ বলল মিহরান মাসিস।

‘বাস্তবতা অনেক সময় রূপকথাকেও ছাড়িয়ে যায়।’ ওরান্তি ওরারতু বলল।

‘তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এই বিস্ময়কর মানচিত্রের সন্ধান কি করে পেলেন? জানলেন কি করে যে, মানচিত্রটি ভ্যান মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত

সেকশনে আছে? আমি তো বহুবার মিউজিয়ামের আরারাত সেকশনে গেছি, কিন্তু মানচিত্রটি তো দেখিনি!’ বলল মিহরান মাসিস।

‘সে আর এক কাহিনী মি. মিহরান মাসিস। বেশ কিছুদিন আগে ইয়েরেভেনের সেন্ট মেরী মনস্টারিতে কয়েকদিন ছিলাম। মনস্টারির জ্যেষ্ঠতম ফাদার পিটার জনকে আপনি চেনেন। বয়স তার ১০৯ বছর। জীবন্ত এক মিউজিয়াম তিনি। মাউন্ট আরারাতকে যিশুর জন্মস্থান বেথেলহেমের মতই ভক্তি করেন তিনি। আর মাউন্ট আরারাত সম্পর্কে তার চেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর্মেনিয়া ও তুরস্কে আর কেউ নেই। মাউন্ট আরারাত বিষয়ে তার সাথে কয়েকদিন ধরে আলাপ করেছি। কথায় কথায় আমি মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভাণ্ডারের কল্পকাহিনী সম্পর্কে বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এটা কল্পকাহিনী নয়, পিতা নুহার নৌকার মতই বাস্তবতা ওটা। তবে মা মেরীর ঐ সম্পদ মা মেরী মানুষের চোখ থেকে আড়াল করে ফেলেছেন। পিতা নুহার নৌকা ল্যান্ড করার জায়গায় যেদিকে নৌকার সামনের দিকটা ছিল, তার সামনের এক গুহায় স্বর্ণভাণ্ডার সংরক্ষিত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৪০ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের মাধ্যমে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘তাহলে আমাদের পবিত্র পর্বতের আদিরূপ আর নেই। এটা ভক্তদের জন্যে এক বিরাট ক্ষতি নয় কি?’ তিনি বলেছিলেন, ‘এটা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েছে বৎস। এ নিয়ে কথা তোলো না। তবে পবিত্র পর্বতের আদিরূপ দেখতে চাইলে, তারও একটা সুযোগ ঈশ্বর রেখেছেন।’ বলে থেমে গিয়েছিলেন তিনি। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আমি উদগ্রীব হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘কি সেই সুযোগ, কোথায় সেই সুযোগ?’ তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন। স্থির দৃষ্টিতে দেখেছিলেন আমাকে। পরে বলেছিলেন, ‘কি বলছিলে, তুমি ‘লাভার অব হোলি আরারাত’-এর নেতা? হ্যাঁ, তোমার এটা জানার রাইট আছে।’ বলে একটু চুপ থেকে তিনি শুরু করেছিলেন, ‘অন্তত একটা মানচিত্রে পবিত্র মাউন্ট আরারাতের আদিরূপ সংরক্ষিত আছে। এই মানচিত্রটি তৈরি হয়েছিল খৃস্টপূর্ব ৫শ’ অব্দের কোন এক সময়। সময়টি ছিল এক মাহেন্দ্রক্ষণ। যখন পবিত্র মাউন্ট আরারাত মাথায়-টুপির মত আস্তরণ ছাড়া সমগ্র গা থেকে বরফের পোশাক ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল,

যেমনটা ছিল ঠিক প্লাবন ও প্লাবন-উত্তর কিছু সময়ে। সেই সময় ওরান্তি রাজবংশের বিজ্ঞানী সভাসদ ঈশ্বরভক্ত নাইরো নারিজিয়ান এই মানচিত্র তৈরি করেন।' বলে আবার থেমে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ পিটার জন। ইজিচেয়ারে গা'টা এলিয়ে আবার চোখ বুজেছিলেন। মানচিত্রের কথা শুনে বুকটা আমার তোলপাড় করে উঠেছিল। মানচিত্রটা কোথায় পাওয়া যাবে, তা জানার জন্যে আমি মরিয়া। আমি বললাম, 'ঐ মানচিত্রেই পবিত্র মাউন্ট আরারাতের আদি রূপ জানা যাবে। কিন্তু মানচিত্রটি পাওয়া যাবে কোথায়?' বৃদ্ধ ফাদার আবার চোখ খুলল। তাকাল আমার দিকে। চোখে সেই সন্ধানী দৃষ্টি। বলল, ''লাভার অব হোলি মাউন্ট আরারাত' সংগঠনের তুমি প্রধান না! হ্যাঁ, তোমাকে বলা যায়। মানচিত্রটি ওরান্তি রাজবংশের প্রপার্টি ছিল। অনেক রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানচিত্রটির স্থান হয় লেক-ভ্যানতীরস্থ ঐ অঞ্চলের প্রাচীনতম মনস্টারি তিলকিটেপী ধর্মালয়ে। এই যুগের এক খনন কাজের মাধ্যমে তিলকিটেপী ধর্মমঠ আবিষ্কৃত হলে অন্যান্য সব প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যের সাথে পোড়া চোয়াং রক্ষিত মানচিত্রটিও ভ্যান ক্যালিস প্রাসাদ মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি তখন ভ্যানে ছিলাম। আমার মত প্রবীণ ধরনের কয়েকজন গীর্জার প্রতিনিধি ও প্রত্নতত্ত্ববিদকে ডাকা হয় মানচিত্রটাকে ক্ল্যাসিফাই করার ক্ষেত্রে মতামত দেয়ার জন্যে। আমরা মানচিত্রটিকে মাউন্ট আরারাতের প্রাচীনতম মানচিত্র হিসেবে অভিহিত করি। এরপরই অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ভ্যান ক্যালিস মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশনে ওটা রাখা আছে। আমি আনন্দিত, মাউন্ট আরারাতের আদিরূপের নিদর্শন ঈশ্বর এভাবে সংরক্ষিত করলেন।' বৃদ্ধ ফাদার পিটার জনের এই কাহিনী আমার হাতে আকাশের চাঁদ তুলে দেয়। হাতে চাঁদ পাওয়ার মতই খুশি হই। সেই মানচিত্র নিয়েই ওরা এখন ভ্যান থেকে আসছে। আমার মন অস্থির হবে না কেন বলুন?'

'আপনার কথা ঠিক ওরান্তি ওরারতু! সত্যিই মানচিত্রটি মহামূল্যবান। আর এ মানচিত্রের সন্ধান পাওয়ার কাহিনী রূপকথাকে হার মানায়। আমি মনে করছি, আমাদের মিশন সফল হবে, দুর্লভ মানচিত্রের এই সন্ধান পাওয়াটা তারই লক্ষণ।' বলল মিহরান মাসিস।

‘ঈশ্বর আপনার কথাকে সত্যে পরিণত করুন।’ বলে আবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল ওরান্তি ওরারতু। বলল, ‘দেরি নেই, অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে যাবে।’

ওরান্তি ওরারতুর কথা শেষ হতেই বাইরের লনে গাড়ির শব্দ পেল।

কান খাড়া ওরান্তি ওরারতু এবং মিহরান মাসিস দু’জনেরই।

গাড়ির শব্দ তাদের বাড়ির গাড়ি বারান্দায় এসে থেমে গেল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরান্তি ওরারতু ও মিহরান মাসিস দু’জনেই।

দু’জনেই ছুটল বাইরে বেরুবার জন্যে।

মানচিত্রটি বার বার খুঁটে খুঁটে দেখার পর মুখ তুলল মিহরান মাসিস ও ওরান্তি ওরারতু দু’জনেই।

তাকাল তারা পরস্পরের দিকে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দ।

প্রথমেই মুখ তুলল মিহরান মাসিস। বলল, ‘আমার অবাক লাগছে, সে সময়ের শিল্পীরাও এমন থ্রি-ডাইমেনশনাল নকশা আঁকতে পারতো! পবিত্র মাউন্ট আরারাতের অদ্ভুত এই থ্রি-ডাইমেনশনাল নকশা। ছবির মতই দেখা যাচ্ছে সব কিছু।’

‘ছবি কয়টি ডাইমেনশনালে তা নিয়ে আমার কাজ নেই মি. মিহরান মাসিস, আমার আগ্রহ আরারাতের সাড়ে পনের হাজার ফিট থেকে ষোল হাজার ফিটের বরফমুক্ত এলাকা, বিশেষ করে মাউন্ট আরারাতের পশ্চিম ঢালের উত্তর-পশ্চিম কোণটা। পনের হাজার পাঁচশ’ ফিট ওপরের এই স্থানেই প্লাবন শেষে মহান পিতা নুহের নৌকা ল্যান্ড করেছিল। নকশার এই স্থানে নজর করে দেখুন, পাহাড়ের এক গভীর ভাঁজে শিল্পী নৌকার মত একটা স্থাপনার ওপরের অংশ এঁকেছেন। নৌকার ডেকটা দেখা না গেলেও দেখুন, ডেকের ওপরের বিশাল দুই-আকৃতির একটা স্থাপনাকে শিল্পী স্পষ্ট করে তুলেছেন। এই স্থাপনার সামনের প্রান্ত থেকে কিছুটা জায়গা বাদ দিয়ে আরও সামনে তীরের মত কৌণিক একটা

জিনিসকে মাথা উঁচু করে থাকতে দেখা যাচ্ছে! নিশ্চয় সামনের গুহাই হবে। এর চারপাশে পর্বতের গায়ে এবং পর্বতের খাঁজ ও ভাঁজের মেঝেতে দেখুন, নানা আকারের গুহাকে শিল্পী খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। এই গুহাগুলোই আমাদের সব আগ্রহ ও আকর্ষণের কেন্দ্র। আকুলভাবে এই গুহাগুলোর অবস্থা ও দর্শনই আমরা চেয়েছি। ঈশ্বর সেটা আজ আমাদের দিলেন। শিল্পীকে ধন্যবাদ যে, পবিত্র পর্বতের নকশা আঁকার ক্ষেত্রে এই এলাকার নকশাতেই যেন নজর দিয়েছেন বেশি, এই এলাকার নকশাকেই তিনি সবচেয়ে বিস্তারিত ও নিখুঁত করতে চেয়েছেন। দখুেন পর্‌বতরে ঢাল, খাঁজ ও ভাঁজে পাথরগুলোর অবস্থানকেও তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন। ধন্যবাদ শিল্পীকে। ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। পবিত্র স্বর্ণভাণ্ডারের প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ, তাকেও অনুমোদন দিয়েছেন নিশ্চয়।’

দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল ওরান্তি ওরারতু। তার কণ্ঠে উত্তেজনা এবং চোখে-মুখে লোভের আগুন যেন জ্বল জ্বল করে উঠেছে।

‘সত্যিই ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করেছেন। না হলে এই দুর্লভ ডকুমেন্ট আমরা হাতে পেতাম না। কিন্তু আসল কাজই আমাদের বাকি। পনের হাজার পাঁচশ’ ফিট লেভেলের গুহাগুলোর সন্ধান আমরা পেলাম, লোকেশনও জানলাম, কিন্তু খুঁজে বের করব কি করে? তুর্কি সৈন্যরা তো কাউকে পাহাড়ে দু’দণ্ডও দাঁড়াতে দেয় না।’ বলল মিহরান মাসিস।

‘সেটাই তো সমস্যা। তবে এই সমস্যা দূর করার কাজও তো আমরা শুরু করে দিয়েছি। এবং সে কাজ খুব ভালোভাবেই এগোচ্ছে। এই অঞ্চলের টার্গেট পরিবারগুলোকে ড্রাগ-ব্যবসায়ের ফাঁদে ফেলার আমাদের কৌশল খুবই কাজ দিচ্ছে। আমাদের দেয়া তথ্য ঠিক ঠিক পাওয়ায় পুলিশও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। পুলিশের অধিকাংশকেই আমরা কিনতে পেরেছি। শুধু ইজডির এলাকারই আড়াই হাজার পরিবারের তিন হাজার মানুষকে আমরা জেলে ঢোকাতে পেরেছি। ইতোমধ্যেই এখান থেকে বারশ’ পরিবার উচ্ছেদ হয়ে গেছে। এই বারশ’ পরিবারের জায়গায় আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে নতুন বারশ’ পরিবারকে বসাতে পেরেছি, যাদের মোট জনসংখ্যা পাঁচ হাজার হবে। যে হারে

আমাদের কাজের অগ্রগতি হচ্ছে, তাতে বছরখানেকের মধ্যে ইজডির, কারস, অ্যাগ্রি ও ভ্যান প্রদেশ এলাকায় টার্গেটেড পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ এবং তাদের স্থানে আমাদের লোকদের পুনর্বাসন সম্ভব হবে।' ওরান্তি ওরারতু বলল।

'আমিও তাই মনে করছি। আমরা যতটা চাচ্ছি তার চেয়েও কাজ দ্রুত হচ্ছে। কিন্তু আমি ভয় করছি, পুরাতন পরিবারের উচ্ছেদ আর নতুন পরিবারের পুনর্বাসন সরকারের চোখে না পড়ে যায়।' বলল মিহরান মাসিস।

'নতুন পরিবারের পুর্নবাসন হচ্ছে এ কথা কেন বলছেন? আপনিই না সবকিছু করেছেন। ইস্তাম্বুল, আংকারাসহ উত্তরের শহরগুলোতে যে আর্মেনীয় পরিবারগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাদের মধ্যে যারা বেশি রাজনীতি সচেতন, তাদেরকে গত দশ-পনের বছর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব ইজডির, কারস, অ্যাগ্রি ও ভ্যানের মত প্রদেশগুলোতে ভোটার বানানো হয়েছে পরিকল্পিতভাবে সুনির্দিষ্ট সব ঠিকানায়। কেউ বুঝতে পারলেও প্রমাণ করতে পারবে না যে, অন্য অঞ্চল থেকে এরা এসেছে। গত তিনটি নির্বাচন কিংবা তারও বেশি সময়ের ভোটার তালিকায় তাদের নাম আছে, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স পরিশোধ আছে। অতএব ভয়ের কিছু নেই মি. মিহরান মাসিস।'

হাসলো মিহরান মাসিস। বলল, 'ধন্যবাদ মি. ওরান্তি ওরারতু। কাগজে-কলমে আমরা ঠিক আছি। কিন্তু আসলেই তো তারা হবে নতুন। এ বিষয়টা প্রশাসনসহ সচেতনদের চোখে পড়ে যেতে পারে। আমি এই ভয়টাই করছি।'

হাসল ওরান্তি ওরারতুও। বলল, 'যাদের আপনি সচেতন বলছেন, যারা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে, তারা হয় জেলে থাকবে, নয়তো উচ্ছেদ হবে টাকা-পয়সা নিয়ে। সুতরাং প্রতিক্রিয়া প্রকাশের কেউ থাকবে না মি. মিহরান মাসিস।'

'এটাই ভরসা মি. ওরান্তি ওরারতু যে, যারা উচ্ছেদ হচ্ছে, তারা ঠিক উচ্ছেদ নয়। তারা জমি ও সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ পেয়ে নিজেরা সরে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের কোন অভিযোগ থাকছে না, প্রতিক্রিয়া প্রকাশেরও সুযোগ তাই হবে না। টাকা-পয়সা প্রচুর খরচ হলেও অবাঞ্ছিত পপুলেশনকে

এইভাবে সরিয়ে দেয়ার আমাদের কৌশল খুবই ভালো হয়েছে।’ বলল মিহরান মাসিস।

‘এজন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় ‘আমরা মানুষ’ নামের ইহুদি এনজিওকে। বুদ্ধিটা ওরাই দিয়েছে। ‘আমরা মানুষ’-এর প্রেসিডেন্ট মোশে অ্যাসেনাথ বলেছিলেন, ‘এই ধরনের তৃণমূল পরিবর্তনের কাজ কখনও গায়ের জোরে করবে না, বুদ্ধি দিয়ে করবে। বুদ্ধির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো টাকা। কৌশলে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি কর, নিরাপত্তাহীনতার আতংক ছড়াও, তারপর টাকা দাও নিরাপদ স্থানে সরে পড়ার জন্যে। দেখবে, ওরা তোমার শত্রু হয়ে নয়, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে সরে যাচ্ছে, তুমি যেমনটি চাও।’ টার্গেটেড পরিবার ও লোকদেরকে ড্রাগ-ব্যবসায়ের ফাঁদে ফেলার বুদ্ধিও ‘আমরা মানুষ’ নামের ঐ ইহুদি এনজিওর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। ধন্যবাদ তাদেরকে। তাদের এই বুদ্ধি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে কাজ দিচ্ছে।’ ওরান্তি ওরারতু বলল।

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কিন্তু মি. ওরান্তি ওরারতু, একটা বড় গণ্ডগোল তো বেঁধে গেছে। আরিয়াসের বারজানি পরিবারকে কেন্দ্র করে আমাদের পরিকল্পনা সাংঘাতিকভাবে মার খেয়েছে। আপনি জানেন, ঐ পরিবারের সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য যুবক আতা সালাহ উদ্দিন বারজানিকে ড্রাগ-ব্যবসায়ের ফাঁদে ফেলে জেলে পুরেছি। তার পিতা-মাতা আছেন মস্কোতে। তাদের তরফ থেকে এখনও ভয়ের কিছু ঘটেনি। কিন্তু আতা সালাহ উদ্দিনের বোন ড. আজদা আয়েশা এসেছে জার্মানি থেকে। সেই এসে ঝামেলা পাকিয়েছে। তাকে ড্রাগের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। ড্রাগ-ফাঁদ পাতার জন্য আমাদের বালক-বালিকা বাহিনীর একজন বালককে পাঠানোও হয়েছিল ড. আজদার ঘরে ড্রাগ রাখার জন্যে। কিন্তু ড. আজদা তাকে ধরে ফেলে। গোপনীয়তা যাতে বালকটি ফাঁস করতে না পারে সেজন্যে থানায় নিয়ে যাওয়ার পথে আমাদের লোকরা বালকটিকে হত্যা করে।’

বলে মিহরান মাসিস থামল এবং টেবিল থেকে পানির গ্লাস তুলে নিল।

‘চমৎকার কাজ করেছে আমাদের লোকরা। এরপর আমাদের কিছু লোক সেখানে মারা গেছে, এই তো! এটা আমি ভ্যান থেকেই শুনেছি।’ বলল ওরান্তি ওরারতু।

মিহরান মাসিস পুরো গ্লাসের পানি ঢক ঢক করে গিলে নিয়ে বলল, 'শুধু লোক মারা যাওয়া নয়, সেই লোকেরা কি অবস্থায় কিভাবে মারা গেল, তা অ্যালার্মিং। আমাদের একজন মূল্যবান বালক হারাবার শোধ নেয়ার জন্যে সেদিনই সন্ধ্যা রাতে ড. আজদাকে কিডন্যাপ করতে গিয়েছিল আমাদের কিছু লোক। ঠিক সেসময় পুলিশ সেখানে হাজির হয় এবং কিডন্যাপ করে ফেরার পথে আমাদের চারজনই পুলিশের গুলিতে মারা যায়, অথচ পরিচয় জানার পর পুলিশ তাদের মারার কথা নয়। আমাদের নীতি অনুসারে সেদিন রাতেই ড. আজদাকে তার বাড়ি থেকে ধরে আনার জন্যে দুর্ধর্ষ কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছিল। তারা সকলেই মারা পড়ে। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে শত্রুকে সময় না দেয়ার আমাদের যে নীতি, সেই অনুসারে হোম সার্ভিসের গাড়ি করে হোম সার্ভিসের ছদ্মবেশে আমাদের ৭জন কমান্ডো যায় সেখানে। ৭ জন কমান্ডোই মারা পড়েছে। পরবর্তী এই দু'ঘটনায় পুলিশের সাহায্য আমরা পাইনি।'

বিস্ময় ফুটে উঠেছিল ওরান্তি ওরারতুর চোখে-মুখে। মিহরান মাসিস থামতেই সে বলে উঠল, 'কে হত্যা করল তাদের? ঐ পুঁচকে মেয়েটা? তা কি করে সম্ভব?'

'মেয়েটা নয়, তাদের বাড়িতে আসা একজন মেহমান। সম্ভবত ড. আজদার কোন আত্মীয়।' মিহরান মাসিস বলল।

'বারজানি পরিবার ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সবাই তো আমাদের নখদর্পণে। তাদের মধ্যে কেউ এই অসাধ্য সাধন করেছে বলে তো মনে হয় না।' বলল ওরান্তি ওরারতু।

'আমিও বুঝতে পারছি না কি ঘটনা। ইজডির পুলিশের ডিওপি খাল্লিকান যে মেসেজ আমাদের দিয়েছেন, সেটাও উদ্বেগজনক। বলেছেন তিনি, ড. আজদাদের মেহমান লোকটি সাধারণ নয়। রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের সাথে তার যোগাযোগ থাকতে পারে।' মিহরান মাসিস বলল।

'রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের সাথে তার যোগাযোগ থাকতে পারে? তাহলে সে সে?' বলল ওরান্তি ওরারতু। উদ্বেগ তার কণ্ঠে।

তার কথা শেষ হতেই মিহরান মাসিসের পিএস মিহরান মাসিসকে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার, আরিয়াস থেকে মি. ভারদান এসেছেন।'

'হ্যাঁ, আমরা তাকেই আশা করছিলাম। নিয়ে এস তাকে।'

ভারদান বুরাগ আরিয়াস অঞ্চলের 'সোহা' প্রধান।

মিনিটখানেকের মধ্যেই ভারদান বুরাগ ঘরে প্রবেশ করল। মিহরান মাসিস ও ওরান্তি ওরারতু দু'জনেই স্বাগত জানাল তাকে।

ভারদান বুরাগ গিয়ে মিহরান মাসিসের সামনের সোফায় বসল।

'সোজা আরিয়াস থেকে এলেন?' জিজ্ঞেস করল মিহরান মাসিস ভারদান বুরাগকে।

'স্যার, আরিয়াস থেকে ভ্যান হয়ে এখানে আসছি স্যার।'

'বল কি খবর?' জিজ্ঞাসা মিহরান মাসিসের।

'ভালো নয় স্যার। লোকটি এসে সবকিছুই লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে।' বলল ভারদান বুরাগ।

'কোন লোক? ড. আজদার অতিথি?' মিহরান মাসিস বলল।

'ঠিক বলেছেন স্যার! ঐ লোকটিই।' ভারদান বুরাগ বলল।

'লণ্ডভণ্ড কি করছে? দু'ঘটনায় আমাদের তেরজন লোক মেরেছে, সেটাই কি?' বলল মিহরান মাসিস।

'শুধু এটাই নয় স্যার। লোকটি যে যাদুকর। এসেই যেন সব জেনে ফেলছে। এসেই নাকি সে পুলিশকে জানিয়েছে, ইজডিরসহ দক্ষিণ-পূর্বের কয়েকটি প্রদেশ থেকে লোক উচ্ছেদ করে বাইরের লোক এনে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। সর্বশেষে আমরা জানতে পেরেছি, সে লোক লাগিয়েছে বাড়ি বাড়ি ঘুরে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে তাদের অভিযোগ সত্য প্রমাণের জন্য।' ভারদান বুরাগ বলল।

ভারদান বুরাগের কথা শুনে মিহরান মাসিস ও ওরান্তি ওরারতু দু'জনের মুখ কালো হয়ে গেছে। ওরান্তি ওরারতুর মুখ ফেটেই যেন চিৎকার বেরুল, 'বলছ কি ভারদান বুরাগ? এসেই লোকটা এসব জানতে পেরেছে?'

'সেটাই তো আশ্চর্যের। তারা থানায় যে কেস করেছে, তাতেও তাদের এসব কথা আছে। পুলিশ আমাদের এটা জানিয়েছে।' বলল ভারদান বুরাগ।

'লোকটি কে তোমরা জেনেছ?' জিজ্ঞাসা মিহরান মাসিসের।

'জানা যায়নি। তবে সে যে বারজানি পরিবারের আত্মীয় নয়, এটা নিশ্চিত। পুলিশের কাছ থেকেও এ ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পুলিশ সদস্য রশিদ দারাগ চিকিৎসা নিচ্ছেন ভ্যানে। আর ডিওপি খাল্লিকান খাচিপ তেমন কিছু তথ্য দিতে পারেননি।' ভারদান বুরাগ বলল।

'কোথায় এখন লোকটি?' বলল ওরান্তি ওরারতু।

'গতকাল ভ্যানে এসেছে। এসে এখানেও গণ্ডগোল পাকিয়েছে।' ভারদান বুরাগ বলল।

'কি গণ্ডগোল?' মিহরান মাসিস বলল।

'গণ্ডগোল মানে এখানেও আমাদের কাজে বাগড়া দেবে বলে মনে হচ্ছে। আমি এখানে রওয়ানা দেয়ার আগে পুলিশ সূত্রে জানতে পারলাম, ভ্যান ক্যালিস প্রাসাদ মিউজিয়ামের এই রাতের রক্তাক্ত অভিযানের ঘটনাকে সে মাউন্ট আরারাতের উল্কিধারী মানে আমাদের কাণ্ড বলে পুলিশকে জানিয়েছে। আরও মজার...।'

ভারদান বুরাগের কথার মাঝখানেই ওরান্তি ওরারতু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠল, 'উল্কিধারীর কথা সে বলেছে? জানল কি করে আমাদের মাউন্ট আরারাতের সদস্যরা উল্কি ধারণ করে! অসম্ভব ব্যাপার!'

'সে জন্যেই তো লোকটা যাদুকর। আরও একটা বড় ব্যাপার হলো, ভ্যানের পুলিশ সূত্রেই আমি জানলাম, মিউজিয়ামে রক্তাক্ত এ ঘটনার দায়ে মিউজিয়ামের প্রধান গ্রেফতার হওয়া অবধারিত ছিল। ডিজিপি পুলিশ নিয়ে স্বয়ং গিয়েছিলেন ড. মাহজুন মাজহারকে গ্রেফতারের জন্যে। কিন্তু সেখানেও হাজির ঐ যাদুকর লোকটি ড. আজদা ও ড. সাহাব নুরীকে নিয়ে। লোকটি তার যুক্তি দিয়ে ঘটনার মোড় একেবারে পাল্টে দেন এবং ড. মাহজুন মাজহার নির্দোষ হয়ে যান এবং মিউজিয়ামের হামলাকারীরা কিভাবে, কোন কৌশলে মিউজিয়ামে

প্রবেশ করেছে, তারও সম্ভাব্য তথ্য সে পুলিশকে দিয়েছে। পুলিশ সে অনুসারে তদন্তও শুরু করে দিয়েছে।'

'অসম্ভব সব কথা বলছেন মি. ভারদান। কিভাবে একজন লোক এভাবে সবজান্তা হতে পারে? পুলিশকে দেখছি এভাবে সে হাতের মুঠোয় নিয়ে ফেলেছে। কল্পনারও অতীত ঘটনা এসব।' বলল মিহরান মাসিস।

'ভ্যানে কোথায় উঠেছে লোকটা?' বলল ওরান্তি ওরারতু।

'ভ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরীর বাড়িতে।' ভারদান বুরাগ বলল।

ওরান্তি ওরারতু তাকাল মিহরান মাসিসের দিকে। বলল, 'এসব শুনে আর লাভ নেই মি. মিহরান মাসিস। এখন বলুন কি করা যায়? ঐ লোকটিকে এক মুহূর্তও বাঁচিয়ে রাখা যায় না।'

'এখন সব কাজ ছেড়ে ঐ লোকটিকেই দেখতে হবে। সত্যিই বলেছেন, ওকে বাঁচিয়ে রেখে আমাদের সামনে এগোনো সম্ভব নয়।' বলল মিহরান মাসিস।

'একজনের জন্যে সব কাজ বন্ধ থাকবে না। আমাদের সব কাজই চলবে, চলতে হবে আরও দ্বিগুণ বেগে। এর পাশাপাশি আমরা লোকটিকেও দেখবো। আমাদের বাছাই করা কমান্ডোদেরকে আজই পাঠাতে হবে ভ্যানে। দরকার হলে আমিও সেখানে যাবো। ভ্যানে এই মুহূর্ত থেকেই তার ওপর চোখ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।' ওরান্তি ওরারতু বলল।

'তার ওপর সার্বক্ষণিক চোখ রাখার ব্যবস্থা আমরা করেছি। সে আরিয়াস থেকে ভ্যানে এলে আমাদের দু'জন তাকে অনুসরণ করে ভ্যানে এসেছে এবং তার ওপর সার্বক্ষণিকভাবে চোখ রাখছে।' বলল ভারদান বুরাগ।

ওরান্তি ওরারতুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ মি. ভারদান বুরাগ। আমি আনন্দিত যে, আপনারা সময়ের সাথে এগোচ্ছেন।'

ভারদান বুরাগের কথা শেষ হতেই মিহরান মাসিস বলল, 'তাহলে এখন উঠা যাক। আজকেই ভ্যানে লোক পাঠাতে হবে। কাদের পাঠানো যায়, আপনিও ভাবুন। আমিও দেখছি। সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোর এ পর্যন্তকার বিশ্লেষণে বুঝেছি,

লোকটি বিপজ্জনক। সাবধানে এগোতে হবে। তাকে কাবু করতে, বাগে আনতে আরও কি করা যায়, সেসব বিকল্প নিয়েও ভাবতে হবে।’

‘ঠিক মি. মিহরান মাসিস। আপনি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, সেসব নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে।’

বলে উঠে দাঁড়াল ওরান্তি ওরারতু।

উঠে দাঁড়াল মিহরান মাসিস।

ভারদান বুরাগও।

আহমদ মুসা ভ্যান ক্যালিস মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করে নেমে এল লেক ভ্যানের তীরে। তারপর লেক ড্রাইভে উঠে তার গাড়ি ছুটে চলল দক্ষিণে।

লেক ড্রাইভ লেক ভ্যানের তীর বরাবর তৈরি মনোরম সড়ক। পর্যটকদের অত্যন্ত প্রিয় এই সড়ক। একদিকে পাহাড়ের শ্রেণী, তার পাদদেশে পরিকল্পিত বনায়নের সবুজ-সমারোহ। অন্যপাশে হ্রদের দিগন্ত প্রসারিত নীল-শান্ত জলরাশি।

এই সুন্দর সড়ক লেক ড্রাইভ ধরেই এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাহিবা সাবিতরাই আহমদ মুসাকে এনেছে এই লেক ড্রাইভ দেখার জন্যে।

আহমদ মুসা এসেছিল ভ্যান ক্যালিস মিউজিয়াম দেখতে। আসলে আহমদ মুসা সরেজমিনে যাচাই করতে চেয়েছিল মাউন্ট আরারাতের মানচিত্র চুরির বিষয়টা। তার সাথে এসেছিল ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা। আর সাহিবা সাবিতকে ড. মাহজুন মাজহারই পাঠিয়েছিল গাইড হিসেবে।

মিউজিয়ামে সাহিবা সাবিতই প্রস্তাব করেছিল লেক ড্রাইভে যাবার জন্যে। বলেছিল, এ সময় লেক ড্রাইভ ফাঁকা থাকে, বেড়িয়ে আরাম আছে। সকালে বিকালে তো গাড়ির হাট বসে যায়।

ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা বিষয়টা আহমদ মুসার ওপর ছেড়ে দিয়েছিল। আহমদ মুসা প্রথমে সাহিবা সাবিতের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। কিন্তু শেষে নাছোড়বান্দা সাহিবা সাবিতের জেদে আহমদ মুসা বলে, ঠিক আছে, চল আগে মিউজিয়ামে যাই।

মিউজিয়ামে এসে গাড়ি থেকে নেমেই সাহিবা সাবিত মিউজিয়ামের এক ড্রাইভারকে ডেকে তার হাতে টাকা দিয়ে বলেছিল, আমরা লেক ড্রাইভে যাব, আপনি গাড়িতে পেট্রল ভরে রাখুন। সকালে পেট্রল নেয়া হয়নি।

এর মাধ্যমে লেক ড্রাইভে আসা পাকাপোক্ত হয়ে যায়। আহমদ মুসাকে আসতে হয় লেক ড্রাইভে।

কিন্তু লেক ড্রাইভে যাত্রা করে কয়েক গজ যেতেই একটা মারাত্মক ঘটনার মুখোমুখি হয় তারা।

গাড়ি ড্রাইভ করছিল আহমদ মুসা।

ড্রাইভ করে কয়েক গজ যেতেই আহমদ মুসার জ্যাকেটের বুক পকেটে গুঁজে রাখা কলমের মাথা থেকে খুব ধীরলয়ে বিপ বিপ শব্দ বেরিয়ে আসে এবং একটা লাল সিগন্যাল আসতে শুরু করে।

চমকে উঠেছিল আহমদ মুসা। একসাথেই তার সারা দেহের রক্ত কণিকায় একটা বিদ্যুৎ চমক খেলে যায়।

চোখের পলকে আহমদ মুসা গাড়ি রাস্তার কিনারায় ঘুরিয়ে নেয়। রাস্তার কিনারায় গিয়ে একটা হার্ডব্রেক কষে আহমদ মুসা। দ্রুত কণ্ঠে আদেশের স্বরে বলে, সবাই তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়ুন।

আহমদ মুসার পাশে বসেছিল ড. সাহাব নুরী এবং পেছনের সীটে বসেছিল ড. আজদা ও সাহিবা সাবিত। আকস্মিকভাবে গাড়ি ঘুরিয়ে হার্ডব্রেক কষায় প্রায় সকলেই সীটের ওপর পড়ে গিয়েছিল।

এই অবস্থায় আহমদ মুসার নির্দেশ পেয়ে তারা বিমূঢ়ভাবে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়েছিল।

কিন্তু আহমদ মুসার শক্ত হয়ে উঠা গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কোন কথা না বলে তারা দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে পড়ে।

আহমদ মুসাও দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে গাড়ি ঘুরে বিমূঢ়ভাবে দাঁড়ানো ড. আজদাদের কাছে গিয়ে বলে, গাড়ির কোথাও বোমা বা কোন ধরনের বিস্ফোরক পাতা আছে। আপনাদের আরও সরে আসতে হবে গাড়ির কাছ থেকে।

'বোমা? গাড়িতে বোমা পাতা আছে?' আতংকিত কণ্ঠে বলল ড. সাহাব নুরী। আর ড. আজদা ও সাহিবা সাবিতের চোখ বিস্ফারিত। আকস্মিক আতংকে তারা প্রায় বাকরুদ্ধ।

তারা ফুটপাতের ওপর উঠে আরও কিছুটা দূরে সরে গেল।

গাড়ি তখন মিউজিয়ামের গেট থেকে খুব দূরে আসেনি। মিউজিয়ামের গেটের সামনে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল।

আহমদ মুসা হাত তুলে তাদের ডাকে।

গেটের পুলিশের সাথে আহমদ মুসাকে পরিচয় করে দিয়েছিল সাহিবা সাবিত। সাহিবা সাবিত আহমদ মুসার অলক্ষ্যে পুলিশ অফিসারকে এ কথাও বলেছিল যে, খোদ ডিজিপি মাহির হারুন এনাকে 'স্যার' বলে, বুঝলেন!

আহমদ মুসার হাত ইশারা পেয়ে ছুটে আসে পুলিশের গাড়িটি।

আহমদ মুসা ইশারা করে তাদের গাড়ি থেকে একটু দূরে পুলিশের গাড়ি দাঁড় করায়।

দ্রুত পুলিশরা গাড়ি থেকে নেমে আসে। পুলিশ এসে স্যালুট দিয়ে আহমদ মুসাকে বলে, 'কোন সমস্যা স্যার? গাড়ির কি কিছু হয়েছে স্যার?'

'গাড়িতে বোমা বা কোন ধরনের বিস্ফোরক পাতা আছে।' বলল আহমদ মুসা।

শুনেই তটস্থ হয়ে উঠে পুলিশ। পুলিশ অফিসার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, 'স্যার, তাহলে তো এখনি বোমা স্কোয়াডকে ডাকতে হয়।'

'সে অনেক সময়ের ব্যাপার। আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি একটু দেখি, বোমা বা বিস্ফোরক বাইরে কোথাও পাতা আছে কিনা। বাইরে পাতা থাকলে খুব ঝামেলার বিষয় হবে না।'

বলে পা বাড়াল আহমদ মুসা তাদের গাড়ির দিকে।

ছুটে এসে সাহিবা সাবিত আহমদ মুসার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনাকে কিছুতেই গাড়ির দিকে যেতে দেব না।'

বলেই সাহিবা সাবিত তাকাল পুলিশ অফিসারের দিকে। বলল, 'অফিসার, আপনি বোমা স্কোয়াড ডাকুন।'

আহমদ মুসাও বলল, 'ঠিক আছে, ডাকুন বোমা স্কোয়াডকে।'

পুলিশ অফিসার সংগে সংগেই ওয়্যারলেস করল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে।

‘ঠিক আছে সাহিবা, বোমা স্কোয়াড আসছে। আমি একটু দেখি, বোমাটা তারা কোথায় পেতেছে।’

সাহিবা সাবিত তাকিয়েছিল আহমদ মুসার চোখের দিকে। অদ্ভুত এক সম্মোহন শক্তি সে চোখে। সে দৃষ্টির সামনে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। মোমের মত গলে গেল যেন সে। আহমদ মুসাকে আর বাঁধা দিতে পারল না।

আহমদ মুসা গাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল গাড়ির মাঝের গেট বরাবর। মুহূর্তের জন্যে ভাবে, বোমা যদি সত্যিই পাতা থাকে, তাহলে তা পাতা হয়েছে, ড. আজদা অথবা আমাকে মারার জন্যে। সুতরাং তারা চাইবে, বোমার প্রথম আঘাতেই যেন তাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়। সুতরাং গাড়ির মাঝখানে কোথাও তাদের বোমা পাতবে, এটাই যুক্তির দাবি।

গাড়িটি জাপানের মিতসুবিশি কোম্পানীর ৬ সীটের হাইল্যান্ডার জীপ। নিচের বটমটা দেখা খুব কষ্টসাধ্য নয়।

আহমদ মুসা গাড়ির প্রান্তে মুখ নিয়ে দেহটাকে মাটির সমান্তরালে এনে গাড়ির মধ্যাঞ্চলে একটু খোঁজাখুজি করতেই দেখতে পায়, গাড়ির লম্বালম্বি চেসিসের মধ্য বরাবর স্থানে আঠালো টেপ দিয়ে বোমাটি আটকানো।

দ্রুত ভালো করে দেখার জন্যে আহমদ মুসা মাথাটি ভেতরে নিয়েছিল। দেখতে পেল, টাইমারযুক্ত বোমা। টাইমারের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আহমদ মুসা। এখনও দেড় মিনিট বাকি।

আহমদ মুসা পকেট থেকে লেজার কাটার নিয়ে বাম হাতের বৃদ্ধা, তর্জনী ও মধ্যমা এই তিন আঙুল দিয়ে অতি সন্তর্পণে বোমাটি ধরে ডান হাত দিয়ে লেজার কাটারের সাহায্যে বোমাকে গাড়ির চেসিস থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল এবং বোমাটিকে ঐভাবে বাম হাতের তিন আঙুলে আলতোভাবে ধরে পেছনমুখী ক্রলিং করে ইঞ্চি ইঞ্চি করে গাড়ির তল থেকে বের হয়ে এসেছিল।

ঘামে ভিজে গিয়েছিল আহমদ মুসার দেহ।

আহমদ মুসা বের হয়ে আসতেই পুলিশরা ছুটে এল।

‘স্যার, বোমা পাওয়া গেছে?’ বলল পুলিশ অফিসারটি।

'হ্যাঁ অফিসার, এটা টাইম বোমা। আর মাত্র ৩০ সেকেন্ড সময়। কোন নিরাপদ জায়গায় একে ফেলতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার, আমাদের ফুটপাতের ওপারেই একটা পরিত্যক্ত ভাঙা স্থাপনা আছে, সেখানেই ছুঁড়ে দিন স্যার।' বলল পুলিশ অফিসার।

ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাহিবা সাবিত আহমদ মুসার হাতে বোমা দেখে ও মাত্র ৩০ সেকেন্ড সময় আছে জেনে আতংকে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

আহমদ মুসা দ্রুত কয়েক পা হেঁটে ফুটপাতে উঠে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বাম হাতের তিন আঙুলেই বোমাটি ছুঁড়ে দিল পরিত্যক্ত স্থাপনার দিকে।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত। বিকট শব্দে বোমার বিস্ফোরণ ঘটল। মুহূর্তেই পাথরের তৈরি পরিত্যক্ত স্থাপনা ধুলো হয়ে গেল।

সকলের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ সেদিকে।

পুলিশের বোমা স্কোয়াডও এসে গেছে।

ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাহিবা সাবিত এল আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসা ঘুরে ফিরে আসছিল।

সাহিবা সাবিত আহমদ মুসার মুখোমুখি হয়ে বলল, 'কি দরকার ছিল এই ঝুঁকি নেয়ার, স্যার? পুলিশের বোমা স্কোয়াড তো এসেই পড়ল।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'তেমন বড় কোন দরকার ছিল না। তবে এটুকু হতো যে, বোমা স্কোয়াড এসে বোমা পেত না, আর তুমি গাড়ি পেতে না, আর আমি বোমাটা কোথাকার তৈরি তা জানতে পারতাম না।'

'অমন লাখো গাড়িও আপনার সমান নয়। তবে আমি বলতে পারব না বোমাটা কোথাকার তৈরি তা না জানলে কি এমন ক্ষতি হতো?' বলল বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে সাহিবা সাবিত।

পুলিশ অফিসার সামনে এগিয়ে এল আহমদ মুসার। বলল, 'স্যার, বোমাটি কোথাকার তৈরি তা কি আপনি জেনেছেন?'

'একটা ব্র্যান্ড চিহ্ন দেখেছি, নিশ্চিত করে কিছু বলার আগে আরও ভাবতে হবে অফিসার।' বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ স্যার। আর একটা কথা, আমাদের মনে হয় মিউজিয়ামের ড্রাইভার তেল ভরার জন্যে গাড়ি নিয়ে যাবার পর গাড়িতে বোমা পাতা হয়েছে। তাকে গ্রেফতার করলেই সব জানা যাবে।’ পুলিশ অফিসারটি বলল।

‘তাকে গ্রেফতার করুন, জিজ্ঞাসাবাদ করুন, কিন্তু আমার মনে হয়, সে কিছুই জানে না। গাড়িতে তেল ভরার সময় বোমা পাতার কাজটা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ঐ সময়টায় কি কি হয়েছে, কে কি দেখেছে, তা জানা গেলেই সত্যটা জানা যাবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু স্যার, ওখানে তো অনেক লোক থাকে। এত লোকের মধ্যে কেউ ঐ ধরনের কিছু করে ফেলল, সেটা কতটা সম্ভব!’ পুলিশ অফিসার বলল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ওখানে শুধু তেল ভরাই হয় না, গাড়ির পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হয়। আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় অনেক কিছুই করা সম্ভব।’

অফিসার আহমদ মুসাকে একটা স্যালুট দিয়ে বলল, ‘ধন্যবাদ স্যার, ঠিক বলেছেন আপনি।’

একটু থেমেই পুলিশ অফিসারটি আবার বলে উঠল, ‘স্যার, বোমার এ কেসটা কি ম্যাডাম সাহিবা করবেন? গাড়িটা তো তার।’

‘ওকে অফিসার, কেস আমিই করব। এখনি ফেরার পথে থানায় কেসটা রেকর্ড করে যাব।’ বলল সাহিবা সাবিত।

‘ওকে ম্যাডাম’ বলে অফিসারটি সবাইকে সালাম দিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

পুলিশ চলে যেতেই সাহিবা সাবিত আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘চলুন স্যার, আমরা ফিরি। ফেরার পথে কেসটা দায়ের করে যাব।’

‘কিন্তু সাহিবা সাবিত, আমি লেক ভ্যান দেখব বলে লেক ড্রাইভে যাবার জন্যে অলরেডি কিছুটা পথ এগিয়ে এসেছি। আমি লেক ড্রাইভটা ঘুরে আসি, তোমরা গাড়ি নিয়ে চলে যাও।’ বলল আহমদ মুসা।

বিমর্ষতার একটা ছায়া খেলে গেল সাহিবা সাবিতের মুখে। ভাবল সে, এভাবে সরাসরি ফিরে যাবার কথা বলা তার ঠিক হয়নি। সাহিবা সাবিত তাকাল

ড. আজদার দিকে। আবার ফিরে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘স্যার, এতবড় ঘটনা ঘটল, আপনার পোশাক ধূলি-ধূসরিত হয়েছে, এজন্যেই বলছিলাম স্যার। কিন্তু আপনার সিদ্ধান্তের সাথে আমি আছি স্যার।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘সাহিবা, তোমার প্রস্তাবে আমি কিছু মনে করিনি। তুমি যেটা বলেছ সেটাই স্বাভাবিক। আমার অনুরোধ, তোমরা মামলা দায়েরের কাজটা শেষ করে যাও। আমি পরে আসব, মনে হচ্ছে আমার কিছু কাজ আছে।’

‘মনে হচ্ছে কিছু কাজ আছে, এর অর্থ কি ভাইয়া? আপনি লেক ড্রাইভে যাবেন, সেটাই কি কাজ?’ বলল ড. আজদা।

‘লেক ড্রাইভে যাওয়া কোন কাজ নয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, যে যাওয়াটা আমার বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে, সে যাওয়াটা আমার শেষ করা দরকার। এই ‘শেষ করা’টাকেই আমি কাজ বলছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে স্যার, আমাদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেন?’ বলল সাহিবা সাবিত।

‘বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে। কেস দায়ের হওয়া জরুরি। এছাড়া তেমন আর কোন কারণ নেই।’

‘তাহলে ঘুরে এসেই আমরা কেস দায়ের করব। আমরা এখন যাত্রা করতে পারি।’ সাহিবা সাবিত বলল।

‘ভাইয়া, চলুন আমরা যাত্রা করি।’ বলল ড. আজদা।

সবাই গাড়িতে উঠল। আগের মতই আহমদ মুসা ড্রাইভিং সীটে। তার পাশে ড. সাহাব নুরী। পেছনের সীটে ড. আজদা ও সাহিবা সাবিত।

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল।

এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি ড. সাহাব নুরী। গাড়ি চলতে শুরু করলে সে বলল, ‘মি. আবু আহমদ আব্দুল্লাহ, মৃত্যু থেকে আমরা কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ছিলাম। গাড়ি ঐ কয়েক মিনিট চললে আমাদের সাক্ষাৎ মৃত্যু ঘটতো। আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে বিব্রত করবো না। কারণ প্রশংসা আপনি পছন্দ করেন না।’

বলে থামল ড. সাহাব নুরী। একটু থেমেই বলল, ‘কিন্তু একটা বিস্ময় আমার মনে মি. আবু আহমদ। বোমার অস্তিত্ব আপনি টের পেলেন কি করে?’

আহমদ মুসা ডান হাত স্টিয়ারিং হুইলে রেখে বাঁ হাত দিয়ে পকেটের কলমটা বের করে বলল, ‘এই কলম আমাকে সিগন্যাল দিয়েছে।’

‘ওটা কি এক্সক্লুসিভ ডিটেক্টর জনাব?’ জিজ্ঞাসা সাহিবা সাবিতের।

‘আরও অনেক কিছু।’ হাসির সাথে বলল আহমদ মুসা।

কলমটি পকেটে রাখল আহমদ মুসা।

গাড়ি চলছিল পশ্চিম দিকে লেক অভিমুখে।

তীরের কাছাকাছি পৌঁছে লেক ড্রাইভে উঠল আহমদ মুসার গাড়ি। এবার গাড়ি চলতে শুরু করল তীর ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে।

গাড়িতে নীরবতা।

নীরবতা ভাঙল সাহিবা সাবিত। বলল, ‘স্যার, পুলিশ সাহস করল না। বোমা স্কোয়াডকে ডেকে পাঠাল। কিন্তু আপনি বোমার সন্ধানে লাগলেন। বোমাটা বের করেও আনলেন। কিন্তু টাইম বোমার বার্স্ট হওয়ার সময় যদি ঐ সময়েই শেষ হয়ে যেত এবং বিস্ফোরণ ঘটত?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ঐ বোমায় আমার মৃত্যু লেখা থাকলে, সেটাই ঘটতো, কিন্তু মৃত্যু লেখা ছিল না বলে টাইম বোমার সময় তখন দেড় মিনিট ছিল।’

আহমদ মুসার নির্বিকার এই জবাবে সবার চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

সাহিবা সাবিতের চোখে-মুখে তখন অপরিচিত এক বেদনার কালো ছায়া। বলল সে, ‘জীবনকে ভালোবাসা মানব ফিতরাতেরই একটা অংশ এবং এটা আল্লাহর দেয়া। আপনি এই ফিতরাতকে লংঘন করেছেন স্যার।’

গম্ভীর হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। বলল, ‘তুমি খুব ভারি কথা বলেছ সাহিবা সাবিত। আমার ওপর তোমার অভিযোগটাও মারাত্মক এবং এটা সত্য। কিন্তু সাহিবা সাবিত, জীবনের ঝুঁকি জীবন সংগ্রামেরই একটা অংশ। একে বাদ দিলে জীবনের চাকা পদে পদে অচল হয়ে পড়তে পারে।’

‘জেনারেল রুল হিসেবে আপনার কথা সত্য। কিন্তু অনেক বিশেষ ক্ষেত্রে এটা সত্য নয়। যেমনঃ একটা গাড়ি রক্ষার জন্যে আপনি জীবনের ঝুঁকি নিতে পারেন না।’ গম্ভীর ও ভারি কণ্ঠ সাহিবা সাবিতের।

‘তোমার এ কথাও সত্য সাহিবা সাবিত। কিন্তু সাহিবা, এই ঘটনায় গাড়ি রক্ষা মূল বিষয় ছিল না। মূল বিষয়টা ছিল বিস্ফোরকের সন্ধান করা। পুলিশের বোমা স্কোয়াডও এটাই করতো। তারা যেটা করতো, আমিও সেটাই করেছি। গাড়ির বটমটা দেখতে দিয়ে গাড়ির চেসিসের সাথে বোমাটা দেখে ফেলি। একই সাথে দেখে ফেলি যে, বোমাটা টাইম বোমা এবং সময় দেড় মিনিট আছে। এই সময়ের মধ্যে বোমাটা বাইরে নিয়ে নিরাপদে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব। আমি তাই করেছি। আল্লাহর দেয়া ফিতরাত আমি লংঘন করিনি সাহিবা।’ বলল আহমদ মুসা।

সাহিবা সাবিতের মুখ থেকে বেদনার মেঘ অনেকখানি কেটে গেছে। চোখে তার মুগ্ধতার একটা ঔজ্জ্বল্য। ঠোঁটে প্রসন্নতার অপরিস্ফুট হাসি। বলল, ‘স্যার, কথার রাজা যদি কেউ হন, তাহলে যুক্তিও তার হাতের মুঠোয় চলে যায়। সুতরাং আমার কোন কথা নেই। তবে স্যার, আমার মতটা বলি। এ ধরনের ঝুঁকি আমি নিজের জন্যে পছন্দ করি না, অন্য কারও জন্যে করব কেন?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তোমার এই যুক্তিতে আমার সব যুক্তি শেষ, সব কথা শেষ। তাহলে তোমাকে তো কথার সম্রাট বলতে হয়। কি বল তুমি আজদা?’

‘ঠিক বলেছেন ভাইয়া। আসলেই সে কথার সম্রাট। ওর গোটা একাডেমিক ক্যারিয়ারে ডিবেটে প্রথম স্থান ওর জন্যে বরাদ্দ।’ ড. আজদা বলল।

ড. আজদার কথাগুলো আহমদ মুসার কানে গেল না। তার চোখ তখন গাড়ির রিয়ারভিউ মিররে নিবদ্ধ। রিয়ারভিউতে দেখতে পাচ্ছে সে একটা গাড়িকে। অনেকক্ষণ ধরেই দেখছে গাড়িটাকে। আহমদ মুসাদের গাড়ির সমান গতিতে আসছে। গাড়ির গতি অতিসন্তর্পণে কম-বেশি করে কমিয়ে-বাড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে, গাড়িটির নিজস্ব কোন গতি নেই। তার মানে, গাড়িটি তাদের অনুসরণ করছে। নিশ্চয় ওরা উল্কিওয়ালারাই। ওরাই বোমা পেতে ছিল।

বোমার ফাঁদ ওদের ব্যর্থ হয়ে গেছে। বোমার ফাঁদ ব্যর্থ হলে বিকল্প চিন্তাও তাদের ছিল! আহমদ মুসা স্বীকার করল, আসলেই গ্রুপটা দূরদর্শী ও নাছোড়বান্দা। কিন্তু গাড়িটা আমাদের অনুসরণ করছে কেন? কি তাদের মতলব? আহমদ মুসা ডুবে গিয়েছিল চিন্তায়।

তার দু'হাত স্টিয়ারিং হুইলে এবং চোখ দু'টি সামনে প্রসারিত। কিন্তু তার মনটা পড়ে আছে দু'পাশের রিয়ারভিউ মিররে। মাঝে মাঝেই দু'চোখ চকিতে ফিরিয়ে এনে মনিটর করছে রিয়ারভিউয়ের দৃশ্য।

হঠাৎ আহমদ মুসার নীরব হওয়ায় বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে ড. আজদাসহ সবার মধ্যে। পাশের সীটে বসা ড. সাহাব নুরী আহমদ মুসার চোখে-মুখের ভাবান্তর আরও কাছ থেকে লক্ষ্য করছে। তার বিস্ময় আরও বেশি। সে পেছন ফিরে ড. আজদাদের দিকে মুখ নেড়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল তাদের দিকে। তারাও প্রশ্ন ফিরিয়ে দিল।

কথা বলল আহমদ মুসাই প্রথম। বলল, 'মি. সাহাব নুরী, এই রাস্তা এভাবে কত দূর গেছে?'

'লেক হিল টানেল পর্যন্ত গেছে।' বলল ড. সাহাব নুরী।

'তারপর?' আহমদ মুসা বলল।

'তারপর রোড টানেলে ঢুকে গেছে। টানেল প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ হবে। টানেল শেষে রোড এভাবেই সামনে লেকের ও প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। তবে আমাদের সামনে যাওয়া শেষ হবে লেক হিল টানেলে গিয়ে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ পারমিশন ছাড়া টানেলে ঢোকা নিষিদ্ধ।' বলল ড. সাহাব নুরী।

'মাঝখানে রোড স্টেশন কিংবা এ জাতীয় কিছু আছে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'সেরকম কিছু নেই। কেন এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন?' বলল ড. সাহাব নুরী।

'সামনে কি আছে আমি বুঝতে চেষ্টা করছি ড. সাহাব নুরী।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন? সামনে এগোলেই তো সব দেখা যাবে।' বলল ড. সাহাব নুরী।

‘সামনে যাওয়াটা কতটা নিরাপদ সেটাই আমি ভাবছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেন এই ভাবনা, কিছু ঘটেছে?’ সাহাব নুরী বলল। তার কণ্ঠে দুশ্চিন্তার ছাপ।

কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবনার ছায়া নেমেছে ড. আজদা ও সাহিবার চোখে-মুখে।

‘ঘটেছে নয়, ঘটছে মি. সাহাব নুরী। আমাদেরকে পেছন থেকে ফলো করা হচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ফলো করা হচ্ছে?’ বলল ড. সাহাব নুরী। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

মুহূর্তে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ল ড. আজদাদের মুখেও।

ড. সাহাব নুরীও গাড়ির রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকাল। দেখতে পেল গাড়িটাকে।

রাস্তায় এখন গাড়ি নেই বললেই চলে। আসলে লেক ড্রাইভে এ সময় কেউ আসে না। লেক ড্রাইভ জমজমাট হয়ে ওঠে বেলা ৩টার পর।

‘গাড়িটা আমাদের ফলো করছে, এটা কি করে বোঝা গেল মি. আবু আহমদ আব্দুল্লাহ?’ জিজ্ঞেস করল ড. সাহাব নুরী।

‘এটা বোঝার জন্যে যা করা দরকার, তা করার পর আমি নিশ্চিত হয়েছি গাড়িটা আমাদের ফলো করছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওদের লক্ষ্য কি?’ বলল ড. সাহাব নুরী। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

‘আমি সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি। সামনে ওদের লোকজন থাকতে পারে। কোথায় কিভাবে থাকতে পারে, সেটা আন্দাজ করার জন্যেই সামনে কি আছে তা জানতে চাচ্ছিলাম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক বলেছেন মি. আবু আহমদ। ওরা আমাদের শুধুই ফলো করছে তার অর্থ সামনে ওদের লোক আছে কোন এক জায়গায় ওঁৎ পেতে।’ বলল ড. সাহাব নুরী।

ড. সাহাব নুরী কথা বললেও তার উদ্বিগ্ন চোখ নিবদ্ধ ছিল গাড়ির রিয়ারভিউ মিররে।

কথা শেষ করেই সে চিৎকার করে উঠল, ‘মি. আবু আহমদ আব্দুল্লাহ, গাড়িটা এবার দ্রুত এগিয়ে আসছে। আপনি গাড়ির গতি বাড়ান।’

আহমদ মুসাও দেখতে পেয়েছিল যে, গাড়িটা ডাবল স্পীডে এগিয়ে আসছে। আহমদ মুসা তার গাড়ির গতি না বাড়ালে দু’তিন মিনিটের মধ্যেই গাড়িটা আহমদ মুসাদের সমান্তরালে এসে যাবে।

আহমদ মুসা তার গাড়ির গতি বাড়াল না। বলল, ‘বাড়িয়ে লাভ নেই। আমরা গতি বাড়াব, সেটা ঐ গাড়িটা জানে এবং গাড়ির গতি বাড়িয়ে লাভ হবে না, সেটাও জানে। জানে বলেই গাড়িটা তার গতি বাড়িয়েছে।’ আহমদ মুসা থামল।

‘তাহলে আমাদের এখন কি করণীয়?’ বলল সাহিবা সাবিত। তার কণ্ঠ শুষ্ক। চোখে-মুখে উদ্বেগ।

ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদারও উদ্বেগে মুষড়ে পড়া ভাব।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওরা কি করছে তা দেখা ছাড়া আমাদের কিছু করণীয় দেখছি না। পেছন থেকে গাড়িটা আসছে, দেখা যাক গাড়িটার কি ভূমিকা হয়।’

কথা বলছিল সামনের দিকে তাকিয়ে। সামনে আর কোন গাড়ি সে দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেল, ওপাশে ফেরার রাস্তা দিয়ে দু’টি মাইক্রো আসছে পাশাপাশি। ঐ দু’টি মাইক্রো ছাড়া ওপাশের ফেরার রাস্তাতেও কোন গাড়ি নেই।

হঠাৎ আহমদ মুসার খেয়াল হলো, তাদের ফলোকারী গাড়ি এবং সামনের মাইক্রোবাস দু’টির গতি একই রকম। শুধু তাই নয়, পেছনের গাড়ি এবং সামনের দু’টি মাইক্রো আহমদ মুসাদের গাড়ি থেকে সমান দূরত্বে।

ভাবতে ভাবতেই পেছনের গাড়ি এবং সামনের দু’টি মাইক্রো আহমদ মুসাদের গাড়ির আরও ক্লোজ হয়ে গেল।

হঠাৎ আহমদ মুসার নজরে পড়ল, তার গাড়ি থেকে বিশ-পঁচিশ গজ সামনে দু’পাশের রাস্তার একটি লিংক চ্যানেল।

লিংক চ্যানেলটা নজরে পড়তেই হঠাৎ যেন সব বিষয় আহমদ মুসার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মাইক্রো দু'টির টার্গেট লিংক চ্যানেল দিয়ে এ রাস্তায় ঢুকে পড়া এবং আহমদ মুসার গাড়ির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ানো।

আহমদ মুসার ভাবতে যতক্ষণ সময় লাগল, ততক্ষণে ঘটনা ঘটে গেছে। মাইক্রো দু'টি লিংক চ্যানেল দিয়ে এ রাস্তায় ঢুকে আহমদ মুসার গাড়ির দিকে ছুটে আসছিল সমান্তরালে গোটা রাস্তা কভার করে।

'সবাই সাবধান!' বলে হার্ডব্রেক করল আহমদ মুসা।

সামনের দু'গাড়িও গজ চারেক এগিয়ে এসে আহমদ মুসার গাড়ির মতই হার্ডব্রেক কষল।

অনুরূপভাবে পেছনের ফলো করে আসা গাড়িটাও আহমদ মুসার গাড়ি থেকে চার গজ মত দূরে এসে বিকট শব্দ তুলে হার্ডব্রেক কষল।

সামনের দু'টি মাইক্রো থামার সংগে সংগেই দুই মাইক্রোর ছাদের একটা অংশ সামনে থেকে সরে গেল। সেখানে বেরিয়ে এল আহমদ মুসাদের গাড়ি তাক করা রকেট লাঞ্চার। আর দু'মাইক্রো থেকে নেমে এল আপাদমস্তক কালো পোশাকের আটজন মানুষ। ওদের সবার হাতে মিনি মেশিনগান। ওরা ছুটে এল আহমদ মুসার গাড়ির সামনে।

কি ঘটতে যাচ্ছে আহমদ মুসা সবই বুঝতে পারল।

ওরা সামনে দাঁড়ানোর আগেই আহমদ মুসা তার এম-১০ রিভলভারের বাঁট দিয়ে তার সামনের উইন্ড স্ক্রীন ভেঙে ফেলল।

একটা রিভলভার হাতেই ছিল আহমদ মুসার এবং জ্যাকেটের বাম পকেট থেকে আরেকটা বাম হতে তুলে নিল।

তার দু'হাতে রিভলভার। তাক করা সামনের দিকে।

ওরা এসে দাঁড়াল সামনে। ওদের হাতেও মিনি মেশিনগান উদ্যত।

রিয়ারভিউয়ে আহমদ মুসা দেখতে পেল, পেছনের গাড়ি থেকেও দু'জন নেমেছে। তারা পজিশন নিয়েছে পেছনে।

এই সময় সামনের গাড়ি থেকে একজন চিৎকার করে বলল, 'আবু আহমদ আব্দুল্লাহ, তোমার খেলা শেষ। তোমাকে হয় আত্মসমর্পণ করতে হবে,

নয়তো তোমাদের সকলকে ধ্বংস হতে হবে। তোমাদের সমেত গাড়িটাকে ছাতু বানিয়ে দিতে আমাদের দু'রকেট লাঞ্চারের একটিই যথেষ্ট। তবে আমরা চাই তোমাকে ও ড. আজদাকে জীবন্ত হাতে পেতে। তোমরা আমাদের লোক মেরেছ। তোমাদের মারার আগে সেই শোধ আমরা তুলতে চাই। এখন সিদ্ধান্ত তোমার। দু'মিনিটের মধ্যে তোমাকে জানাতে হবে, তুমি ও ড. আজদা আত্মসমর্পণ করছ কিনা।'

আহমদ মুসার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ড. আজদা, সাহিবা সাবিত ও সাহাব নুরীদের বাঁচানোর একটা বিকল্প তার সামনে এসেছে। কিন্তু এ বিষয়ের দিকে না গিয়ে সে বলল, 'তোমরা কে জানি না, কিন্তু তোমাদের ঐ রকেট লাঞ্চার দিয়ে আমাদের ধ্বংস করার ভয় দেখিও না। তোমাদের হাতে যে রকেট লাঞ্চার দেখছি, তার ডেস্ট্রাকশন রেডিয়াস হল ৪০ বর্গফুট। সুতরাং আমাদের গাড়ি ধ্বংস করতে চাইলে তোমাদের তিন গাড়ি এবং তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তোমরা বন্দুকধারী, দশটি মিনি মেশিনগানের গুলি চালিয়ে আমাদের চারজনকে হত্যা করতে পার, কিন্তু শুনে রাখ, আমাদের চারজনকে মারতে হলে তোমাদের কমপক্ষে চারজনকে মরতে হবে। তবে আমার দুই হাতের রিভলভার আরও বেশি মারতে পারে, কারণ, আমার হাত তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্র এবং আমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। সুতরাং তোমাদের প্রস্তাব নয়, আমার প্রস্তাবে তোমাদের রাজি হতে হবে।' থামল আহমদ মুসা।

ওদিক থেকে সংগে সংগেই উত্তর এল না।

এদিকে ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাহিবা সাবিত আতংকে একেবারে চুপসে গেছে। ড. আজদা ও সাহিবা সাবিত দু'জনেই কাঁপছে। আর ড. সাহাব নুরী তার বুকের কাঁপুনি থামাতেই পারছে না।

কিন্তু তারা সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে আহমদ মুসার নির্ভয় ও স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনে। তার চেয়ে বড় বিষয় হলো, তারা যে ভয় দেখিয়েছিল, সে ভয় আহমদ মুসা তাদের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে এবং তার প্রস্তাব ওদেরকে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে কার্যত সিচুয়েশনের কমান্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু আবু

আহমদ আব্দুল্লাহর প্রস্তাবটি কি, এ বিষয়টি বিরাট কৌতুহলেরও সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করার পর ওদের তরফ থেকে কোন কথা এল না। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর ওদিক থেকে একটা ভারি কণ্ঠ বলল, 'ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। বল, তোমার প্রস্তাব কি?'

'আমি অনর্থক ভয় দেখাই না। আমি যা বলেছি, তাই ঘটবে। সে যাক, ড. আজদার কোন দোষ নেই। তাকে কিডন্যাপ করার জন্যে তোমাদের লোক যারা কয়েকবার গিয়েছিল, তাদের আমিই হত্যা করেছি। আমার প্রস্তাব হলো, ড. আজদা, ড. সাহাব নুরী ও সাহিবা সাবিত অর্থাৎ আমি ছাড়া গাড়িতে যারা আছেন, সবাই এ গাড়ি নিয়ে চলে যাবেন। আমি একাই আপনাদের হাতে থেকে যাব। এটাই আমার প্রস্তাব।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই 'না' বলে আর্তনাদ করে উঠল সাহিবা সাবিত। বলল, 'এ প্রস্তাব চলবে না। যা ঘটার একসাথে ঘটবে। মরলে একসাথে মরব।' আবেগরুদ্ধ কণ্ঠ সাহিবা সাবিতের।

আহমদ মুসার প্রস্তাবে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে ড. আজদা ও ড. সাহাব নুরীর চোখ। এতো আত্মঘাতী প্রস্তাব আবু আহমদের! বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করার কথা তো ভাবেনি! যা ঘটবে একসাথেই তাদের ওপর ঘটবে, এটাই তো তারা ভাবছিল। এসব চিন্তাই এসে ঘিরে ধরেছে ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদাকে। তাদের কথাই ভাষা পেয়েছে সাহিবা সাবিতের আর্তনাদ ও কথার মধ্যে।

আহমদ মুসার প্রস্তাবের উত্তর এল ওপার থেকে। বলল আবার সেই ভারি কণ্ঠ, 'তোমার প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি আমরা দুই শর্তে। এক. তোমার হাতের দু'টি রিভলভার তোমার গাড়ির ভাঙা উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে এদিকে ফেলে দিতে হবে। দুই. রিভলভার দু'টি ফেলে দেয়ার পর তুমি দু'হাত তুলে বেরিয়ে আসবে। তুমি এসে আমাদের লোকদের সামনে হাত তুলে দাঁড়াবার পর ড. আজদারা গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারবে।'

'আমাকে হাতে পাওয়ার পর এদেরকে নিরাপদে যেতে দেবে, তার গ্যারান্টি তোমাদের শর্তে নেই। ইচ্ছে করলে তোমরা আমাদের সবাইকে

একসাথে মেরে ফেলতে পার। এই ব্যাপারে আমার শর্ত হলো, অস্ত্র আগে ছাড়ব না। অস্ত্র হাতে নিয়েই বের হবো এবং তোমাদের লোকদের সামনে দাঁড়াব। এরপর ড. আজদারা চলে যাবে। তারা নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়ার পর আমি অস্ত্র ত্যাগ করব।' থামল আহমদ মুসা।

'আমরা বিরোধিতা করছি স্যার। আপনি এই প্রস্তাব থেকে সরে আসুন। যা ঘটে ঘটুক, একসাথেই আমাদের ওপরে ঘটুক।' কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল সাহিবা সাবিত।

'আমারও কথা এটাই ভাইয়া। আপনি প্লিজ এমন কিছু করবেন না।' বলল ড. আজদা। তারও কণ্ঠ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ওদিক থেকে সেই কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হলো। বলল, 'ঠিক আছে আবু আহমদ। তোমার কথা মেনে নিলাম। তুমি অস্ত্র নিয়েই বেরিয়ে এস। ড. আজদাদের গাড়ি কিছু দূরে চলে যাবার পর যখন আমরা বলব, তখন অস্ত্র ত্যাগ করে হাত তুলে দাঁড়াতে হবে।'

'ঠিক আছে। আমি বেরুচ্ছি।' বলে আহমদ মুসা তাকাল ড. সাহাব নুরীর দিকে।

ড. সাহাব নুরীর মুখ বেদনায় দীর্ণ। তার চোখ দিয়ে গড়াচ্ছে অশ্রু।

'আমি যাচ্ছি। আপনি ড্রাইভিং সীটে এসে তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে চলে যাবেন।' বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা তার বাঁ হাত ড. সাহাব নুরীর কাঁধে রেখে তাকে সান্ত্বনা দিল।

ড. সাহাব নুরী কিছু বলতে গিয়েও পারল না। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তার।

একসাথে কেঁদে উঠেছে সাহিবা সাবিত ও ড. আজদা।

আহমদ মুসা তার হাতটা ড. সাহাব নুরীর কাঁধ থেকে নামিয়ে তাকাল পেছন দিকে। একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকল ড. আজদা ও সাহিবা সাবিতকে।

তারা মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। দু'জনেই মুখ খুলেছিল কিছু বলার জন্যে।

আহমদ মুসা তাদের বাঁধা দিয়ে বলল, 'এখন কোন কথা নয়। এভাবে ভেঙে পড়া ঠিক নয়। আল্লাহর ওপর ভরসা কর এবং কিছু চাইলে, শুধু তাঁর কাছেই

চাও। বিপদ দেবার ক্ষমতা তাঁরই, বিপদ থেকে বাঁচানোর ক্ষমতাও তাঁর। স্মরণ কর, আল্লাহ বলেছেন, 'ফা-ইন্নামাআল উসরে ইয়োসরা, ইন্নামাআল উসরে ইয়োসরা (সংকটের সাথে সমাধান থাকে, নিশ্চয় সমাধান থাকে সংকটের সাথে)। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ অমোঘ কথার ওপর ভরসা রাখো। কেঁদো না কেউ।'

বলে আহমদ মুসা তাদের কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত গাড়ি থেকে নিচে নেমে গেল।

অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ল ড. আজদা ও সাহিবা সাবিত।

ড. সাহাব নুরী ড্রাইভিং সীটে এসে বসল এবং গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি যাত্রা শুরু করল।

গাড়ি থেকে নেমে আহমদ মুসা ঠিক গাড়ির সামনে দাঁড়াল। তার দু'হাতের রিভলভার উদ্যত সামনের আট দুষ্কৃতিকারীর দিকে।

ড. সাহাব নুরী গাড়ি ঘুরিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে, তা পেছন দিকে না তাকিয়েও বুঝল আহমদ মুসা।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, পেছন থেকে পায়ের চারটি শব্দ এগিয়ে আসছে। আহমদ মুসা ভাবল, নিশ্চয় পেছনের গাড়ির লোক হবে তারা। কেন আসছে তারা? কি তাদের উদ্দেশ্য? গুলি করার ইচ্ছা থাকলে পেছন থেকে এতক্ষণে গুলি করতে পারতো।

পেছন থেকে পদশব্দ দ্রুত হয়েছে।

আরও কিছু ভাবার আগেই পেছন থেকে দু'জন তার দু'হাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'টো রিভলভারই তার হাত থেকে ছুটে গেল।

রিভলভার দু'টি পেছন থেকে আসা দু'জনে তুলে নিয়েছে।

হো হো করে হেসে উঠল গাড়ির ভেতর থেকে সেই কণ্ঠ। বলল, 'আবু আহমদ, হাত ওপরে তোল।'

আহমদ মুসা হাত ওপরে তুলল।

আবার হেসে উঠল সেই কণ্ঠ। বলল, ‘আবু আহমদ, প্রতিশ্রুতি আমরা রক্ষা করতে পারলাম না। কোন শিকার হাতের মুঠোয় আসার পর তাকে ছেড়ে দেয়া আমাদের নীতি নয়।’

আহমদ মুসা দেখল, একটি রকেট লাঞ্চার ওপরে উঠছে।

বুঝতে পারল আহমদ মুসা, ড. আজদাদের গাড়ি লক্ষ্যেই রকেট লাঞ্চার ওপরে উঠছে।

এই বিশ্বাসঘাতকতায় আহমদ মুসার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ধরে গেল। ভাবল, এবার তার রুখে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। তার দু’হাত উঠে আছে কান পর্যন্ত। সে হাতের কয়েক ইঞ্চি পেছনে জ্যাকেটে রাখা আছে যাদুকরী মিনি মেশিন রিভলভার। ট্রিগার টিপে ধরলেই এ রিভলভার থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২৪টি গুলির মিছিল বেরিয়ে আসে। গুলিগুলো আকারে ছোট, কিন্তু প্রত্যেকটি একটি বোমার মত ভয়ংকর।

আহমদ মুসা তাকাল চারদিকে রকেট লাঞ্চারধারীদের দিকে। আহমদ মুসা নিরস্ত্র হবার পর ওরা এখন নিশ্চিন্ত। ওদের ভয়ংকর গানগুলোর ব্যারেল নিচে নামানো।

তখনও রকেট লাঞ্চারের সুঁচালো মাথা ওপরে ওঠা শেষ হয়নি।

আহমদ মুসার ডান হাত বিদ্যুৎ গতিতে ঢুকে গেল ঘাড়ের নিচে জ্যাকেটের পকেটে। হাতটি চোখের পলকে বেরিয়ে এল, তর্জনী রিভলভারের ট্রিগারে।

হাত বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই আহমদ মুসা গুলিবর্ষণ শুরু করেছে। গুলি অব্যাহত রেখেই সে বসে পড়ল এবং পাল্টা গুলি থেকে বাঁচার জন্যে শুয়ে পড়ল। গুলিবর্ষণ তার থামেনি।

পাল্টা গুলিও চলছিল।

কিন্তু আহমদ মুসার রিভলভার এতই ক্ষিপ্রতার সাথে চারদিক ঘুরে এল এবং তার গুলি এতই পয়েন্টেড হলো যে, পাল্টা আঘাতের চেষ্টা যারা করছিল, তারাও গুলি খেয়ে ঢলে পড়ল মুহূর্তে। আহমদ মুসা দ্রুত তার অবস্থানের পরিবর্তন করায় পাল্টা যে গুলি হয়েছিল তা কাজে আসেনি।

গুলি করতে করতেই আহমদ মুসা দ্রুত গড়িয়ে সরে এসেছিল পাশাপাশি দাঁড়ানো দুই মাইক্রোর মাঝখানে আড়াল নেয়ার জন্যে। গড়িয়ে সরে আসার সময় আহমদ মুসা একটা মিনি মেশিনগানও কুড়িয়ে এনেছিল।

আহমদ মুসাদের গাড়ির পেছনে ওদের যে গাড়িটি দাঁড়িয়েছিল, তার দু'জন লোক শুরুতেই আহমদ মুসার গুলিতে মারা পড়েছিল। অবশিষ্ট দু'জনও ঘটনার আকস্মিকতার ধাক্কা সামলে গুলি করতে শুরু করেছিল।

আহমদ মুসা মাইক্রোর আড়াল নেয়ার পর কুড়িয়ে পাওয়া মিনি মেশিনগান দিয়ে ওদের লক্ষ্যে গুলি করা শুরু করে।

ওরা ফাঁকা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছিল। তারা তাদের গাড়ির আড়াল নেবে, এমন আত্মরক্ষামূলক চিন্তা আগে করেনি। আহমদ মুসার গুলি শুরু হলে তারা এটা বুঝল এবং পেছন দিকে ছুটল গাড়ির আড়াল নেবার জন্যে। কিন্তু যাওয়া তাদের শেষ হলো না। ওদের গাড়ির সামনেই ওরা গুলি খেয়ে ঢলে পড়ল।

হঠাৎ আহমদ মুসার খেয়াল হলো, পাশের মাইক্রো থেকে যে লোকটি তার সাথে কথা বলেছে এবং শেষ সময়ে যে রকেট লাঞ্চার তাক করছিল ড. আজদাদের গাড়ি লক্ষ্যে, সে লোকটি কোথায়?

এই কথা মনে হবার সাথে সাথে আহমদ মুসা তার মিনি মেশিনগান ধরা হাত পাশের মাইক্রোর দিকে ঘুরিয়ে নিল অব্যাহত গুলির একটা দেয়াল সৃষ্টি করে।

এভাবে বাঁ দিকে ঘুরতে গিয়েই আহমদ মুসা দেখল, পাশের মাইক্রোর ওপাশ থেকে একজন লোক ছুটে গিয়ে মাইক্রোর সামনে পড়ে থাকা নিহত একজনের মিনি মেশিনগান হাতে তুলে নিচ্ছে। কিন্তু মিনি মেশিনগান হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই আহমদ মুসার গুলির দেয়ালের মধ্যে পড়ে ঝাঁঝরা দেহ নিয়ে একজন সাথীর মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ল।

আহমদ মুসা দেখতে পেল, এই লোকটি অন্যদের চেয়ে আলাদা। এর পরনে আপাদমস্তক কালো পোশাক নেই। তার বদলে রয়েছে কুর্দিশ মৌলভির পোশাক।

এর এই পোশাক কেন? সংগে সংগেই এ প্রশ্ন জাগল আহমদ মুসার মনে। এটা কি উল্কিওয়ালাদের এক ক্যামোফ্লেজ? এটাও হতে পারে মানুষকে প্রতারণা করার জন্যে, নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বুঝল, মাইক্রো থেকে এই লোকটিই তার সাথে কথা বলেছিল এবং এর হাতেই ছিল রকেট লাঞ্চার। আর তার হাতে মিনি মেশিনগান ছিল না। ছিল না বলেই সে আক্রমণে আসতে পারেনি। অবশেষে একটা মিনি মেশিনগান কুড়িয়ে আনতে গিয়েই তাকে শেষ হতে হলো।

আহমদ মুসা চারদিকে চোখ বোলাল। দেখল, তেরটি লাশ তার সামনে। এরা শুধু আমাকে নয়, আমাদের সবাইকেই মারতে চেয়েছিল, সবাইকে মারতে গিয়েই এরা সবাই লাশ হয়ে গেল, হিসেব করল আহমদ মুসা। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় বিনত হলো আহমদ মুসার হৃদয়-মন-মাথা সবই। নিজের জীবন দিয়ে হলেও তিনজন নিরপরাধ মজলুমকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম বলে আল্লাহ আমাকেও বাঁচিয়ে দিলেন! আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে সজল হয়ে উঠল আহমদ মুসার দু'চোখ।

গাড়ি সামনের দিকে চলছিল। কিন্তু সাহিবা সাবিত ও ড. আজদা দু'জনেই আকুল চোখে তাকিয়েছিল পেছনে। অবিরাম অশ্রু ঝরছিল তাদের চোখ দিয়ে।

সাহিবা সাবিত ও ড. আজদা দু'জনেরই চোখ নিবদ্ধ ছিল আহমদ মুসা যেখানে ঘেরাও হয়েছেন, সেই ঘটনাস্থলের দিকে।

হঠাৎ তারা গুলি-গোলার অব্যাহত শব্দ শুনতে পেল।

খোলা ছিল তাদের গাড়ির সবগুলো জানালাই।

ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল তারা দু'জনেই। তাহলে কি সব শেষ হয়ে গেল! বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠল সাহিবা সাবিতের। পেছনে তাকিয়ে সে চিৎকার

করে বলল, ‘গাড়ি থামান মামা। ওখানে গুলি-গোলা হচ্ছে। দেখা দরকার ওর কি হলো। থামান মামা গাড়ি।’

‘না সাহিবা সাবিত, ওর নির্দেশ, আমাদের নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে। তোমাদের, আমাদের বাঁচানোর জন্যেই তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তোমাদের কোন বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।’ বলল ড. সাহাব নুরী।

‘না, ওর কথা আমি মানি না। উনি নিজের ওপর অবিচার করেছেন, আমাদের প্রতি অবিচার করেছেন। আমি যাব সেখানে।’

বলে ড্রাইভিং সীটের দিকে এগোলো সাহিবা সাবিত। বলল, ‘মামা, হয় আপনি সেখানে চলুন, না হয় ড্রাইভিং আমাকে দিন। আমি সেখানে যাব।’

‘তুমি পাগল সাহিবা। সেখানে গিয়ে তুমি, আমি, আমরা কি করব। এই চিন্তা করেই তো তিনি আমাদের চলে আসতে বাধ্য করেছেন। ঠিক আছে, চল আমরা এক জায়গায় গিয়ে গাড়ি পার্ক করি। ওরা চলে গেলে আমরা সেখানে গিয়ে খোঁজ নেব।’ বলল ড. সাহাব নুরী।

‘সেখানে প্রচণ্ড গুলি-গোলার শব্দ শোনার পর আমি ফিরতে পারবো না। আপনারা আমাকে নামিয়ে দিন, হেঁটেই আমি সেখানে যাব।’ সাহিবা সাবিত বলল। স্থির সিদ্ধান্ত তার কণ্ঠে।

‘সাহিবা একটু বুঝতে চেষ্টা কর, আমরা সেখানে গিয়ে কি করব, কি করতে পারব?’ বলল ড. সাহাব নুরী। কণ্ঠ তার নরম।

‘ওর সাথে মরতে তো পারব!’ সাহিবা সাবিত বলল কান্নাজড়িত কণ্ঠে।

ড. সাহাব নুরী তাকাল ড. আজদার দিকে।

ড. আজদা বলল, ‘সাহিবা সাবিত যা বলেছে সেটাই আমার মত। উনি যদি না থাকেন, তাহলে আমরা পালিয়েও বাঁচতে পারবো না। মরতে যদি হয়, তাহলে তার সাথে মরাই ভালো।’ কান্নায় ভেঙে পড়া ড. আজদার কণ্ঠ।

‘ঠিক আছে, আল্লাহ ভরসা।’ বলে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল ড. সাহাব নুরী।

ছুটে চলল গাড়ি ফেলে আসা সেই ঘটনাস্থলের দিকে।

আহমদ মুসা সার্চ করছিল লাশগুলো উল্কিওয়ালা বলে তার কাছে পরিচিত এই গ্রুপটির ঠিকানা কিংবা এদের আরও পরিচয় পাওয়া যায় কিনা এজন্যে।

আপাদমস্তক কালো ইউনিফর্ম পরা লাশগুলো ওদের বিশেষ কমান্ডো বলে তার মনে হলো। এর আগে এই গ্রুপের আরও যাদের লাশ দেখেছে, তারা এই ধরনের ইউনিফর্ম পরা ছিল না।

এদের সার্চ করে কিছু পেল না আহমদ মুসা।

সব শেষে আহমদ মুসা সবার পরে নিহত হওয়া কুর্দিশ মৌলভীর পোশাক পরা লোকটির কাছে এল। এই লোকটিকেই দলনেতা মনে হয়েছে আহমদ মুসার।

তার পকেটে পেল একটা মানিব্যাগ। মানিব্যাগ খুলতেই চোখে পড়ল কিছু আর্মেনীয় ও টার্কিশ টাকা এবং আইডি কার্ড। দ্রুত আইডি কার্ডটাই দেখল আহমদ মুসা। কার্ডটিতে লোকটির একটি কুর্দিশ নাম আছে। পরিচয় লেখা হয়েছে একটি কুর্দি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে।

আইডি দেখেই আহমদ মুসা বুঝল, এটা ভুয়া। তুর্কি পুলিশকে বোকা বানানোর জন্যেই এই পরিচয় নেয়া হয়েছে।

মানিব্যাগটা আরও ভালো করে সার্চ করতে গিয়ে মানিব্যাগের একটা কেবিনে পেল চার ভাঁজ করা ছোট্ট এক টুকরো কাগজ। গুরুত্বপূর্ণ হবে কিছু, এটা মনে করে কাগজটা তাড়াতাড়ি খুলে দেখল, ওটা একদমই সাদা একটা চিরকুট। হতাশ হয়েও আহমদ মুসা ভাবল, একটা সাদা কাগজকে এভাবে সযত্নে ভাঁজ করে মানিব্যাগের গোপন পকেটে রাখা হবে কেন? একটা রহস্যের গন্ধ পেল আহমদ মুসা।

কাগজটি পকেটে পুরল আহমদ মুসা।

হঠাৎ পেছনে গাড়ির শব্দ পেয়ে 'ডিজিপি মি. মাহির হারুন এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লেন'-এই বিস্ময় নিয়ে পেছনে তাকাতেই দেখল, ড. সাহাব নুরীর গাড়ি। গাড়িটি এসে দাঁড়িয়ে গেছে পেছনের সেই গাড়িটার কাছে।

গাড়ি থেকে নেমেছে ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা। যন্ত্রচালিতের মত তারা আসছে আহমদ মুসার দিকে। আনন্দ-বিস্ময় যেন ফেটে পড়ছে তাদের চোখ–মুখ দিয়ে।

ওরা এসে গেছে।

কোন কথা না বলে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল ড. সাহাব নুরী।

আর পাশে দাঁড়ানো ড. আজদার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। আর ঠোঁটে ছিল হাসি।

আহমদ মুসা ড. সাহাব নুরীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'খুশির সময় এ কান্না কেন?

'কান্না এটা নয়, অপার বিস্ময় ও সীমাহীন আনন্দের গলিত রূপ এটা।' বলল ড. সাহাব নুরী।

'আল্লাহর জন্যেই এ কৃতজ্ঞতার অশ্রু ভাইয়া। আপনি জীবিত আছেন, জীবন্ত আপনাকে দেখতে পাব, এটা ছিল সব হিসেব, সব কল্পনার অতীত।' চোখ মুছে বলল ড. আজদা।

'কিন্তু তোমরা গাড়ি নিয়ে ফিরে এলে কেন, কোন হিসেব থেকে? এমনটা তো হবার কথাই নয়?' বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

হাসল একটু ড. আজদা। বলল, 'আমি উত্তর দিচ্ছি। আমার সাথে একটু আসুন ভাইয়া, প্লিজ!'

বলে পেছন ফিরে তাদের গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল ড. আজদা।

ড. সাহাব নুরীর দিকে একবার তাকিয়ে ড. আজদার পেছনে হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসা।

ড. সাহাব নুরীও হাঁটতে লাগল আহমদ মুসার পেছনে।

গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা ও ড. আজদা। তাদের পেছনে ড. সাহাব নুরী।

গাড়ির জানালা খোলা।

গাড়ির সীটে বসে দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছে সাহিবা সাবিত। কান্নার বেগে কাঁপছে তার শরীর। নীরব কান্না।

আহমদ মুসা তাকাল ড. আজদার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে।

'সাহিবাই আমাদের এখানে ফিরে আসতে বাধ্য করেছে ভাইয়া। গোলা-গুলির শব্দ শোনার সাথে সাথে সে গাড়ি ঘুরিয়ে এখানে আসতে বলে। আপনার নির্দেশের কথা বলে মামা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সাহিবা বলে, গাড়ি যদি ফিরিয়ে না আনা হয়, তাহলে সে হেঁটে হলেও এখানে আসবে। এখানে এসে আমরা কি করব, এর উত্তরে সে বলে, কিছু না পারলে আমরা তার সাথে মরতে তো পারব। আমিও তার কথায় একমত হই এবং আমরা ফিরে আসি। ফিরে আসার সময় সে শক্ত ছিল। কিন্তু এখানে এসে আপনাকে নিরাপদে দেখে সে এভাবে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। এটা সুখের কান্না, স্বস্তির কান্না ভাইয়া।' বলল ড. আজদা। তার মুখে হাসি।

কিন্তু আহমদ মুসার মুখে অস্বস্তির একটা ছায়া খেলে গেল। নিছক আনন্দের কান্না এত দীর্ঘ হয় না, এত গভীর হয় না। গোলা-গুলিতে সে নিশ্চয় আহমদ মুসাকে মৃত ভেবেছিল। তাই মরার জন্যেই সে এসেছিল এখানে। কিন্তু আহমদ মুসাকে নিরাপদ দেখে আকস্মিকভাবে কল্পনাতীত কোন প্রাপ্তি পাওয়ার আনন্দের বাঁধভাঙা জোয়ার নিয়ে হৃদয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যা তার বুক ধারণ করতে পারছে না। সে আনন্দময় এক বেদনা। সে বেদনারই কান্না এটা। মনে মনে উদ্বিগ্ন হলো আহমদ মুসা। এ কান্না শুধু সাহিবা সাবিতের নয়, এ কান্না নতুনভাবে প্রস্ফুটিত এক হৃদয়ের কান্না, যার পরিচয় সাহিবা নিজেও হয়তো জানে না। মনটা কেঁপে উঠল আহমদ মুসার। ভাবল, বাঁচাতে হবে সাহিবা সাবিতকে।

ড. আজদার কথা শেষ হলে ড. আজদার হাসির সাথে আহমদ মুসাও হাসল। বলল একটু উচ্চকণ্ঠে, 'ছোট বোনরা বড় ভাইয়াদের সব সময় একটু বেশি ভালোবাসে। সাহিবা সাবিত এটাই প্রমাণ করেছে ড. আজদা। আজ সকালেই আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি, ড. আজদার পর আরও একটা মিষ্টি ছোট বোন পেয়েছি আমি।'

বলে আহমদ মুসা টান দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ফেলল। বলল, ‘সাহিবা বোন, এস। বাইরে এস।’

ধীরে ধীরে মুখ তুলল সাহিবা সাবিত।

অশ্রু ধোয়া তার কোমল, সুন্দর মুখটি।

চোখ তুলে তাকিয়েছে সে আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু তার চোখে আহমদ মুসার সম্বোধনের প্রতি কোন সাড়া নেই। চোখ দু’টিতে তার তীরবিদ্ধ হরিণীর মত বিস্ময় ও বেদনার বিস্ফোরণ।

চোখ দু’টি তার কিছুক্ষণ পলকহীন স্থির থাকার পর আস্তে বুজে গেল। মুখ ঘুরে গেল। মাথাটি আবার ঝুলে গেল তার দু’হাঁটুর ওপর।

আবার তার সেই কান্না।

ফুলে ফুলে উঠছে তার দেহ কান্নার বেগে।

ওর কাঁদা উচিত, ভাবল আহমদ মুসা। কিন্তু বিব্রত হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা এখন কি বলবে সে এই ভেবে।

গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সেই সাথে পুলিশের গাড়ির সাইরেন।

একাধিক গাড়ির জমাট একটা শব্দ।

‘পুলিশ এসে গেছে ভাইয়া। কেমন করে খবর পেল ওরা?’ বলল ড. আজদা।

বিব্রতকর অবস্থা কেটে গেল আহমদ মুসার। ফিরে দাঁড়াল সে। বলল, ‘পুলিশের ডিজিপি মাহির হারুনকে আমি টেলিফোন করেছিলাম।’

‘চল দেখি কে আসলেন?’ বলে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা।

সবাই এগোলো তার সাথে।

পুলিশ বহরের সামনের জীপেই ছিল ডিজিপি মাহির হারুন।

পুলিশের গাড়ি থামতেই নেমে পড়েছে ডিজিপি মাহির হারুন। আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েই দ্রুত হাঁটতে শুরু করেছে আহমদ মুসার দিকে।

‘স্যার, আসসালামু আলাইকুম। স্যার, টেলিফোনে সব কথা শুনে সংগে সংগেই রওয়ানা দিয়েছি। একটা বড় খবর আছে স্যার।’ উচ্চকণ্ঠে এই কথাগুলো বলে মুহূর্তের জন্যে থামল ডিজিপি মাহির হারুন।

মুহূর্ত পরেই আবার বলে উঠল, 'আংকারা থেকে আমাদের হেডস্যার পুলিশ প্রধান আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। স্যার, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন আপনার নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার জন্যে এবং আরও বলেছেন, আপনাকে সবরকম সহায়তা দেয়ার জন্যে।'

একনাগাড়ে তার কথা বলা শেষ হলে চোখ তুলে তাকিয়েছে সে আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু আহমদ মুসা তার মুখোমুখি হয়ে সালাম নিয়ে হ্যান্ডশেইক করে বলল, 'আপনাদের পুলিশ প্রধানকে ধন্যবাদ। কিন্তু প্লিজ অফিসার, এ কথাগুলো আপনি গোপন রাখুন। শত্রুপক্ষ এসব না জানলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে।'

পুলিশ অফিসার ডিজিপি মাহির হারুনের উৎসাহের আগুনে পানি ছিটানোর মত ব্যাপার ঘটল। অনেকটাই চুপসে গেল ডিজিপি মাহির হারুন। বলল, 'বুঝেছি স্যার! এখনও কাউকে এসব কথা আমি বলিনি।'

'ধন্যবাদ অফিসার। টেলিফোনে সব কথা সংক্ষেপে আপনাকে বলেছি। রেকর্ডের জন্যে লিখিত চাইলে, সেটাও আমি দেব। আপনি এদিকটা দেখুন। আমাকে ফিরতে হবে এখনি। এদের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'অবশ্যই স্যার। আপনি ওদের নিয়ে যান। পুলিশের একটা গাড়ি আপনাদের সাথে পাঠাচ্ছি আপনার নিরাপত্তার জন্যে।' ডিজিপি মাহির হারুন বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ধন্যবাদ অফিসার। পুলিশ প্রটেকশন দরকার নেই। সাথে আমাদের আল্লাহর প্রটেকশন আছে। চলি।'

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে ড. সাহাব নুরীদের বলল, 'আসুন আমরা চলি।'

নতুন বিস্ময়ের ধাক্কা তখন ড. আজদা ও ড. সাহাব নুরীর চোখে। ডিজিপির কথা তারা শুনেছে। তুরস্কের পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন তাদের আবু আহমদ আব্দুল্লাহর নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে! আসলেই কে তাদের এই আবু আহমদ আব্দুল্লাহ!

আহমদ মুসার আহ্বান পেয়ে আহমদ মুসার পেছনে হাঁটতে শুরু করেছে তারা।

৭

‘সাহিবা, শোন মা।’ ডাকল ড. মাহজুন মাজহার সাহিবা সাবিতকে।

সাহিবা সাবিত তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল।

সাহিবা সাবিত ঘুরে দাঁড়িয়ে পিতার দিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে বলল, ‘বলুন বাবা।’

‘আজ ভালো লাগছে শরীরটা?’ জিজ্ঞেস করল মেয়েকে ড. মাহজুন মাজহার।

‘হ্যাঁ বাবা, ভালো।’ বলল সাহিবা সাবিত।

‘কিন্তু মা, মুখটাকে তোমার খুব বিষণ্ন লাগছে।’ বলল সাহিবার বাবা।

‘ও কিছু নয়, রাত জেগে পড়েছি তো এই কারণে।’

কথাটা বলেই সাহিবা সাবিত ভাবল, এই মিথ্যা বলাটা তার ঠিক হয়নি।

‘আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে মা?’ জিজ্ঞাসা ড. মাহজুন মাজহারের।

‘না বাবা, আজ যাব না। ড. আজদা টেলিফোন করেছিল, সে আসছে। আমার স্টাডির একটা বিষয় নিয়ে তার সাথে আলাপ করতে চেয়েছিলাম তো।’ বলল সাহিবা সাবিত।

‘তোমার কাছে শুনেছিলাম, ডিজিপি মাহির হারুন গত রাতে আমাকে বললেন সেদিনের কথা। তিনি বললেন ঘটনাটা অলৌকিকের মত। আবার ড. আজদার কাছে ঘটনাগুলোর কথা শুনেছি, সেগুলোও বিস্ময়কর, অলৌকিকের মতই। সত্যিই বিস্ময়কর এই আবু আহমদ আব্দুল্লাহ। আমি ডিজিপি মাহির হারুনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার কোন পরিচয় তারা উদ্ধার করতে পেরেছেন কিনা। তিনি বললেন, তার ব্যাপারে অনুসন্ধানের সুযোগ আমাদের নেই। স্বয়ং পুলিশ প্রধান তাকে সম্মান করে, সমীহ করে। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীর সাথে নাকি তার সম্পর্ক। আল্লাহই পাঠিয়েছেন আমাদের বিপদের সময় তাকে।’

রাঙা হয়ে উঠেছিল সাহিবা সাবিতের মুখ। কিন্তু তার বুকের মধ্যে তখন বেদনার ঝড়। কতকটা রোদ-বৃষ্টির মত অবস্থা। তার পিতা থামলে বলল সে, 'সাধারণ বিবেচনার বাইরে উনি বাবা। ওরা মনে হয় আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। পরার্থেই ওদের জীবন। বাবা, আমাদের রক্ষার স্বার্থে উনি নিজেকে ওদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন নিজের মৃত্যু অবধারিত জেনেও। এই কুরবানীর কোন পরিমাপ হয় না বাবা।' অপ্রতিরোধ্য এক উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল সাহিবা সাবিতের কণ্ঠ। চোখ তার ভিজে উঠেছে অশ্রুতে।

ড. মাহজুন মাজহার তাকিয়েছিল তার মেয়ের দিকে। সাহিবা সাবিতের আবেগের উত্তাপ, অশ্রুর স্পর্শ তার হৃদয়কেও ছুঁয়ে গেল। এই আবেগ ও অশ্রুর মধ্যে ড. মাহজুন মাজহার একটা নতুনত্বের প্রকাশ দেখে চমকে উঠল।

এ সময় সিঁড়ি দিয়ে দু'তলায় উঠে এল ড. আজদা।

সাহিবা সাবিত চোখ মুছে 'আসি বাবা' বলে ছুটে গেল ড. আজদার দিকে।

সাহিবা সাবিতের দিকে নিবদ্ধ ড. মাহজুন মাজহারের চোখে উদ্বেগের একটা ছায়া নামল।

সাহিবা সাবিত ড. আজদাকে স্বাগত জানিয়ে তার হাত ধরে তাকে নিয়ে চলল তার নিজস্ব স্টাডি রুমে।

তারা স্টাডি রুমে গিয়ে টেবিলে না বসে মুখোমুখি এক সোফায় গিয়ে বসল।

'তোমাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম, তুমি যখন আমাকে ডেকেছ তখন নিশ্চয় সুস্থ্। কিন্তু...।'

'থাক এসব কথা আজদা। আমি ভালো আছি। এস, কাজের কথায় আসি।' ড. আজদার মুখের দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু রেখে কথাগুলো বলল সাহিবা সাবিত।

ড. আজদা তার নত মুখের দিকে মুহূর্তকাল চেয়ে থেকে স্নেহের সুরে বলল, 'সাহিবা, তোমার কাজের কথা বল।'

সাহিবা সাবিত মুখ তুলল।

বলল, 'ধন্যবাদ আজদা। আমার পিএইচডি থিসিসের যে অংশ নিয়ে আমি এখন কাজ করছি, সেটা তুরস্কের জাতিদেহে কুর্দিদের অবস্থান নিয়ে। এ ব্যাপারে তোমার একটা দৃষ্টিভংগি আমি জানতে চাই। এর সাথে আছে তুরস্কের এই পূর্ব আনাতোলিয়ান অঞ্চলের ভবিষ্যত রাজনীতি নিয়ে কথা। এ ব্যাপারেও তোমার একটা ব্রীফ চাই আমি।'

'দুটোই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথম বিষয় সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভংগির কথা বলতে পারি। আমি কুর্দি সম্প্রদায়ের সচেতন সদস্য হিসেবে বলছি, তুরস্ক, ইরাক, ইরান, আজারবাইজান, আর্মেনিয়াসহ এই গ্রন্থিতে কুর্দি সম্প্রদায়কে নিয়ে যে রাজনীতি হচ্ছে, সে রাজনীতি কুর্দিদের সৃষ্টি নয়। যেভাবে ইসলামী খিলাফত বা ইসলামী সাম্রাজ্য ভেঙে তুর্কি, ইরাকি, সিরীয়, লেবাননী, জর্দানি ইত্যাদি জাতির উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, সেভাবেই কুর্দিদের দাঁড় করানো হয়েছে মুসলিম ভূ-খণ্ডগুলোকে আরও খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্যে। কুর্দিরা পশ্চিমী পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্টদের মধ্যকার পৌনে এক শতাব্দী কালের ঠাণ্ডা যুদ্ধেরও শিকার হয়েছে। এ সবের কোনটিই কুর্দিদের স্বার্থে হয়নি, হয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে। সাম্রাজ্যবাদী এই ষড়যন্ত্রই তুরস্কে তুর্কিদের সাথে কুর্দিদের বিরোধ বাঁধিয়েছে। তুরস্কের সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে তুর্কি ও কুর্দি বলে কোন বিভেদ ছিল না। তুরস্কের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট ইসমত ইনোনু একজন কুর্দি ছিলেন। আবার অষ্টম প্রেসিডেন্ট তুরগুত ওজালও একজন কুর্দি ছিলেন। তুরস্কের প্রশাসন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তুর্কি-কুর্দি কোন বিভেদ নেই। এই ঐক্য ও সংহতিকে মূল দৃষ্টি হিসেবে সামনে আনলে তুমি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রটা দেখতে পাবে এবং বাঞ্ছিত উপসংহারে পৌঁছতে পারবে।'

বলে থামল ড. আজদা। কথা শুরু করল আবার, 'তোমার দ্বিতীয় বিষয়টার ওপর আমি কিছু বলতে পারবো না সাহিবা। তবে একজনের নাম বলতে পারি। তিনি খুব স্বচ্ছ দৃষ্টি রাখেন।'

'কে তিনি?' জিজ্ঞাসা সাহিবা সাবিতের।

'তিনি আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।' বলল ড. আজদা।

সাহিবা সাবিতের সারা মুখে রক্তের এক আবির রঙ খেলে গেল।

সে মুহূর্তের জন্যে মুখ নিচু করে আবার স্বাভাবিক হয়ে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ আজদা। কিন্তু আমি ওর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে পারবো না।' সাহিবা সাবিত বলল। তার সারা মুখে সেই বিষণ্নভাব আবার ফিরে এসেছে।

ড. আজদা তাকাল সাহিবা সাবিতের দিকে। বলল, 'তুমি ওকে ভুল বোঝ না সাহিবা। ওর বিবেচনাকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত।'

'আমি ওকে ভুল বুঝিনি আজদা। আমি ভুল করেছিলাম, সেটাই আমি নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু আজদা, তিনি ঐভাবে একটা হৃদয়কে সরাসরি গুলি করে বধ না করলেও পারতেন। তার কথা অন্যভাবে জানান দেয়া যেত। ব্যাপারটা একটা হৃদয়কে পয়েন্ট ব্ল্যাংক গুলি করার মত হয়েছে।' বলল সাহিবা সাবিত। তার কণ্ঠ আবেগে কাঁপছিল।

'তোমার দিক দিয়ে তুমি ঠিকই বলেছ সাহিবা। স্পর্শকাতর এ বিষয়টাকে অন্যভাবেও ম্যানেজ করতে পারতেন। কিন্তু তার দিকটাও ভাব সাহিবা। আমার মতে তিনি তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছেন। তোমার মধ্যে বিভ্রান্তি যেন এক মুহূর্তও আর না থাকে, কষ্ট যাতে আরও গভীর হবার সুযোগ না হয়, এ জন্যেই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বিভ্রান্তির নিরসনে এসেছেন।' বলল ড. আজদা।

'পেরেছেন কি তিনি কষ্টের হাত থেকে বাঁচাতে? পারেননি। যখন তিনি এ চেষ্টা করেছেন, তখন তো একটা জীবনের কুরবানী হয়ে গেছে। মরাকে কি আর বাঁচানো যায় আজদা!' বলল সাহিবা সাবিত। তার কণ্ঠ কাঁপছে। দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

ড. আজদা উঠে গিয়ে সাহিবা সাবিতের পাশে বসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

সাহিবা সাবিতের মাথাটি ঢলে পড়ল ড. আজদার কাঁধে। নীরব কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

কান্নায় বাঁধা দিল না ড. আজদা। শুধু বড় বোনের মত তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল।

সাহিবা সাবিত একটু শান্ত হলে ড. আজদা বলল, 'তুমি এ ভুলটা কেন করলে সাহিবা? তুমি জানতে তিনি বিবাহিত।'

‘সব ভুলে গিয়েছিলাম, সব ভেসে গিয়েছিল বোধহয় সামনে থেকে। সেই সাথে আমি কখন অথৈ সাগরে ডুবে গেছি বুঝতে পারিনি। অন্যায় হয়তো হয়েছে, কিন্তু অন্যায় কিভাবে হলো আমি বুঝতে পারিনি।’ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল সাহিবা সাবিত।

‘সব ঠিক হয়ে যাবে সাহিবা। একটু শক্ত হও। তবে মনে কোন অপরাধবোধ আনা ঠিক হবে না। যা ঘটেছে তা অন্যায় নয়।’ বলল ড. আজদা।

ড. আজদার কাঁধ থেকে মাথা তুলল সাহিবা সাবিত। চোখ মুছে বলল, ‘না আজদা, আমার মধ্যে অন্যায় বোধ নেই। থাকবে কেন? আমি এখনও আমার অধিকারের মধ্যে রয়েছি, কারও অধিকার আমি লংঘন করিনি। আমার ভালো লাগা, ভালোবাসা কারও ক্ষতি করেনি, ওরও নয়।’

‘সাহিবা, এভাবে না ভেবে তোমার সব ভুলে যাওয়া উচিত।’ বলল ড. আজদা।

‘এটা আমি বলতে পারবো না, তবে তোমাকে এ কথা দিতে পারি যে, ওকে বিব্রত করবো না, উনি নতুন সাহিবাকে দেখবেন।’ বলল সাহিবা ধীর কণ্ঠে।

বলেই সোজা হয়ে বসল সাহিবা। বলল, ‘এসব কথা থাক আজদা, এস আমরা আমাদের কাজের কথায় ফিরে যাই। আমার জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় বিষয়ের ব্যাপারে।’

‘সেটাই তো বলছিলাম, এ বিষয়ে আবু আহমদ ভাইয়া তোমাকে সাহায্য করতে পারেন। এ বিষয়টি নিয়ে ওর সাথে আমার একদিন আলোচনা হয়েছিল। দেখলাম, উনি এ বিষয়ে একটা তথ্যের ভাণ্ডার।’ বলল ড. আজদা।

সাহিবা সাবিতের চোখ দু’টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সেখানে নামল বিষণ্নতা। বলল, ‘ওর কাছে কয়দিন আমি যাব না।’

‘কেন?’ বলল ড. আজদা।

‘ঐ যে তুমি শক্ত হতে বললে। সেটাই। মনটাকে আমার আগে শক্ত করতে হবে, যাতে ওর সংস্পর্শে ভেঙে পড়ে কোন নতুন অনর্থ না ঘটায়।’ সাহিবা বলল। ভারি কণ্ঠ তার।

‘ঠিক চিন্তা করেছ সাহিবা। মনটাকে তোমার শক্ত করা দরকার।’

বলে একটু থেমে আবার কথা শুরু করল ড. আজদা। বলল, 'ছেলেমেয়েদের মেলামেশার ক্ষেত্রে ইসলাম যে সীমার নির্দেশ করেছে, সুস্থ সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে তা মানার কোন বিকল্প নেই। তোমার ক্ষেত্রে, আমার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, অবাধ মেলামেশার সুযোগ না থাকলে তা ঘটতো না।'

'আমারটা তো বুঝলাম। তোমার ক্ষেত্রে কি ঘটেছে?' বলল সাহিবা। তার চোখে বিস্ময়।

'ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটেছে। সকালে যেদিন দুষ্কৃতিকারীরা আমাদের বাড়িতে হামলা করেছিল। সেদিন ভীতিকর এক পরিবেশে তার পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় আমি ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। এটা ছিল ওর কাছে আমার আশ্রয় খোঁজা। তিনিও নিশ্চয় এটা বুঝেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যকিছু ভাববার সুযোগ বন্ধ করার জন্যেই তিনি সংগে সংগেই আমাকে বোন বলে সম্বোধন করেছিলেন।' ড. আজদা বলল।

'এটা কি তুমি ড. বারজেনজো ভাইয়াকে বলেছ?' একটু মিষ্টি হেসে বলল সাহিবা সাবিত।

ড. আজদার মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, 'এটা ওকে বলার মত কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়।'

'গুরুত্বপূর্ণ নয় বলছ কেন? টার্নিং পয়েন্টের মত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারতো। যেমন আকস্মিক ঝড় পুরানো স্থাপনা ভেঙে নতুন স্থাপনার দুয়ার উন্মুক্ত করে, তেমনি মুহূর্তের ঘটনা চিরজীবনের হয়ে দাঁড়াতে পারে।' বলল সাহিবা সাবিত গম্ভীর কণ্ঠে।

'ঠিকই বলেছ সাহিবা। এটাই অবাধ মেলামেশার কুফল। যার অসহায় শিকার আমাদের পশ্চিমী সমাজ। এখানে ঘরে-বাইরে আজ সম্পর্কের অস্থিরতা, দাম্পত্য-জীবনে অব্যাহত ভাঙন, পরিবার ব্যবস্থায় বিপর্যয়।' ড. আজদা বলল।

'হ্যাঁ আজদা, তিনি পাথর বলেই তিনি যেমন বাঁচলেন, তুমি বাঁচলে, আমার পথও বন্ধ করা হলো। কিন্তু সবাই তো তার মত বিকর্ষণকারী পাথর নয়, সবাই আকর্ষণ করে। বহুমুখী এই আকর্ষণ থেকেই বহুমুখী বিপর্যয় এসেছে আমাদের পশ্চিমী সমাজে। কিন্তু আমরা বাঁচবো কি করে? ছোটবেলা থেকে

ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশাই তো আমাদের লাইফস্টাইল।’ বলল সাহিবা সাবিত।

‘এ লাইফস্টাইল স্বাভাবিক নয়, সুস্থ নয়, তাই ইসলামীও নয়। আবু আহমদ ভাইয়া স্বাভাবিক ও সুস্থ ইসলামী লাইফস্টাইল অনুসরণ করেন বলেই তিনি বাঁচতে পারেন। আমাদেরও বাঁচিয়েছেন। তিনি একটা জীবন্ত মডেল আমাদের কাছে।’ ড. আজদা বলল।

সাহিবা সাবিত আকস্মিকভাবে ড. আজদার কাছ থেকে একটু সরে বসল। বলল, ‘দেখ আজদা, তুমি এভাবে ওর প্রশংসা করো না, মনকে কিন্তু শক্ত করতে পারবো না, বিগড়ে যাবে কিন্তু মন।’ মুখে হাসি নিয়ে বলল সাহিবা সাবিত।

কথা শুনে ড. আজদাও হেসে উঠল। একটু উঠে সাহিবা সাবিতকে ধরে তার পিঠে কয়েকটি স্নেহের থাপ্পড় মেরে বলল, ‘কানে তালা লাগিয়ে বুঝি মনটাকে ঠিক করবে! মনকে ঠিক করতে হবে বাস্তবতা দিয়ে, বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে।’

সাহিবা সাবিত জড়িয়ে ধরল ড. আজদাকে। হাসতে হাসতে বলল, ‘ভয় পেয়ো না আজদা। ওকে বিব্রত করবো না। বলেছি তো, উনি নতুন সাহিবাকে দেখবেন।’

সাহিবার মুখে হাসি, কিন্তু চোখে অশ্রু।

‘ধন্যবাদ সাহিবা।’ বলল ড. আজদা। সেও জড়িয়ে ধরল সাহিবাকে।

সাহিবার চোখের অশ্রু তার দু’গণ্ডে গড়িয়ে পড়ল।

ভ্যান ক্যালিস প্রাসাদ মিউজিয়ামের ডিজি ড. মাহজুন মাজহারের অফিস।

ড. মাহজুন মাজহার একটা সোফায় বসে। তার সামনের সোফায় পাশাপাশি বসে ভ্যান পুলিশ প্রধান ডিজিপি মাহির হারুন এবং ভ্যানের গোয়েন্দা প্রধান এরফান এফেন্দী।

কথা বলছিল পুলিশ প্রধান মাহির হারুন। বলল, 'স্যার, তদন্তের ব্যাপারে সব আপনাকে বললাম। আমাদের তদন্তে খুঁত নেই। আবু আহমদ আব্দুল্লাহ যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, সেভাবেই কাজ হয়েছে। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার গত ছয় মাসের ভিডিও ক্লিপ থেকে বাইরের তিনজন সন্দেহজনক লোককে চিহ্নিত করা হয়েছে। মিউজিয়ামের গণসংযোগ বিভাগের ডাইরেক্টর মিসেস অ্যানোশ আব্দুল্লাহ গাজেন পাস ইস্যু করে প্রথমে তাদের ভেতরে ঢুকিয়েছে। পরে এই তিনজনই সাংবাদিক পরিচয়ে মিসেস অ্যানোশ আব্দুল্লাহর পাশে মিউজিয়ামের যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়েছে। এই তিনজনই আমাদের প্রাইম সাসপেক্ট। দুঃখের বিষয়, এদের তিনজনকেই লেক ড্রাইভে এক ভয়ংকর অপারেশনে অস্ত্রধারী কমান্ডো হিসেবে মৃত পাওয়া গেছে। এদের সহযোগিতাকারী হিসেবে মিসেস অ্যানোশ গাজেনের নাম এসেছে। এখন তো আমাদের এ্যাকশনে যেতে হয়।' থামল ডিজিপি মাহির হারুন।

ড. মাহজুন মাজহার বলল, 'মিসেস অ্যানোশ আব্দুল্লাহ গাজেন একজন পুরানো, অভিজ্ঞ অফিসার। মিউজিয়ামের সকলের কাছে সে সম্মানিতও। তার ব্যাপারটা একটু কেয়ারফুলি ডীল করুন, আমার অনুরোধ। আপনারা কি তার সাথে এ নিয়ে কথা বলেছেন?'

'জ্বি হ্যাঁ, তার সাথে আমরা কথা বলেছি। উনি বলেছেন, একটা রেস্টুরেন্টে ঐ তিনজনের সাথে তার পরিচয়। ওরা নিজেদের ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক বলে পরিচয় দিয়েছিল। পরে অবশ্য সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছে এমন পরিচয়পত্র দেখিয়েছিল। মিউজিয়াম সম্পর্কে সেদিন তারা তাদের গভীর আগ্রহের কথা বলে এবং জানায় যে, তারা মিউজিয়ামের ওপর ধারাবাহিক গবেষণামূলক ফিচার প্রকাশ করতে চায়। এজন্যে তারা মাঝে মাঝে মিউজিয়ামে যেতে চায়। তারা আমার সাহায্য কামনা করে। যতটা সম্ভব তিনি তাদের সহযোগিতা করেন। এই ছিল তার বক্তব্যের সার কথা।'

'ভেতরে কি আছে জানি না কিন্তু এই কথাগুলোকে আমার কাছে নির্দোষ বলেই মনে হয়।' বলল ড. মাহজুন মাজহার।

‘তার কথাগুলোকে নির্দোষ মনে হচ্ছে স্যার। কিন্তু তিনজন যে পরিচয় দেয় তা দোষযুক্ত। ভ্যানের ফ্রিল্যান্স কিংবা পেশাদার কোন সাংবাদিকই এদের চেনে না। নিজেদের সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে যে পত্রিকার আইডেনটিটি কার্ড তারা দেখিয়েছিল, ঐ নামের কোন সংবাদপত্র এখন ভ্যানে চালু নেই। কিন্তু মিসেস অ্যানোশ গাজেন এসব কোন কিছু খোঁজ না নিয়েই ওদেরকে মিউজিয়ামে ঢোকার অবাধ সুযোগ দিয়েছেন। এটা তার বোকামী, না অন্য কিছু, সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না।’

এই সময় ড. মাহজুন মাজহারের পিএস আহমদ মুসাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

ড. মাহজুন মাজহারসহ সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসাকে স্বাগত জানাল।

ড. মাহজুন মাজহার আহমদ মুসাকে তার পাশের সোফায় নিয়ে বসাল।

‘আপনি কষ্ট করে এসেছেন, এজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ স্যার। স্যার, আমি আপনাকে আমাদের মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর পাবলিক রিলেশন্স সম্পর্কে একটা ইংগিত দিয়েছিলাম। এতক্ষণ ঐ তিনজন ও তার বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিলাম।’

বলে ডিজিপি মাহির হারুন মিসেস অ্যানোশ আব্দুল্লাহ গাজেন সম্পর্কে এতক্ষণ যে আলোচনা হয়েছে তা সংক্ষেপে আহমদ মুসাকে জানিয়ে বলল, ‘ঐ তিনজন মূল কালপ্রিটের মৃত্যুর পর একমাত্র মিসেস অ্যানোশ আব্দুল্লাহ গাজেনই আছেন যার সাথে মিউজিয়ামের ভয়াবহ ঘটনার একটা লিংক আছে। এখন আমরা কি করব, সেটাই আলোচনার বিষয়।’

‘আমার মতে আশু করণীয় হলো, মিসেস অ্যানোশ গাজেনকে সার্বক্ষণিক পাহারায় রাখা। উল্কিওয়ালারা যারা মিউজিয়ামে ডাকাতি করেছে, তারা মিসেস অ্যানোশ গাজেনকে হত্যা করতে পারে। কারণ, আমাদের সামনে একমাত্র সেই আছে যার মাধ্যমে ঘটনা ফাঁস হতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা।

ডিজিপি, গোয়েন্দা অফিসার এরফান এফেন্দী এবং ড. মাহজুন মাজহারের চোখে-মুখে বিস্ময়। ডিজিপি মাহির হারুন ও গোয়েন্দা এরফান

এফেন্দী ভাবল, এই সহজ কথাটা আমাদের মনে হয়নি কেন? এটাই তো স্বাভাবিক।

'ঠিক আছে স্যার, আমি নির্দেশ দিচ্ছি, পুলিশের একটা দল সব সময় অলক্ষ্যে তার পাহারায় থাকবে। আরও আমাদের কি করণীয় স্যার?' ডিজিপি মাহির হারুন পকেট থেকে ওয়্যারলেস বের করে পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বলল, 'মিসেস অ্যানোশ গাজেনের বাড়িতে এখনি সাদা পোশাকে পুলিশের প্রহরা বসাও। এখন তিনি বাড়িতে থাকার কথা।'

'ধন্যবাদ অফিসার। মিসেস অ্যানোশ গাজেন সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন। তার বর্তমান পরিচয়ের আড়ালে আর কোন পরিচয় আছে কিনা।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন এ কথা বলছেন স্যার? আপনি কি অন্য কিছু সন্দেহ করছেন?' বলল ডিজিপি মাহির হারুন। তার ভ্রূকুঞ্চিত।

'আচ্ছা, মিসেস অ্যানোশ আব্দুল্লাহ গাজেনের নামের অ্যানোশ ও গাজেন শব্দ দু'টি কি টার্কিশ?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'শব্দ দুটি তুরস্ক, আর্মেনিয়া, আজারবাইজানে কিছু কিছু ভিন্ন উচ্চারণে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।' বলল ড. মাহজুন মাজহার।

'আচ্ছা, অ্যানোশ' শব্দ কারও নামের অংশ হতে পারে, কিন্তু 'গাজেন' শব্দ কি তুরস্কে নাম হিসেবে মুসলমানরা ব্যবহার করে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো ড. মাহজুন মাজহারের। বলল, 'গাজেন'-এর টার্কিশ সমতুল্য শব্দ হলো 'গায়িন'। এই 'গায়িন' শব্দ ছেলেদের নামের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় তুরস্কে। কিন্তু 'গাজেন' নাম তুরস্কে ব্যবহার হয় না, এটা আর্মেনীয় শব্দ।'

'শুধু এটা আর্মেনীয় নামবাচক শব্দই নয়। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে।' আহমদ মুসা বলল।

'কি ইতিহাস?' জিজ্ঞাসা ড. মাহজুন মাজহার ও ডিজিপি মাহির হারুন দু'জনেরই।

‘ধর্মের জন্যে, আর্মেনীয় জাতির জন্যে জীবনদানকারী একজন খৃস্টান সন্ন্যাসিনীর নাম ‘গাজেন’। তার এই নামে আর্মেনিয়ার একটি চার্চেরও ‘গাজেন’ নামকরণ করা হয়েছে।’

ড. মাহজুনসহ সবার চোখে-মুখে বিস্ময়। ডিজিপি মাহির হারুন বলল, ‘তাহলে মিসেস অ্যানোশ আব্দুল্লাহ তার নামের শেষে এই নাম গ্রহণ করেছেন কেন?’

‘সেটাই তো প্রশ্ন। তিনি মুসলিম হয়ে এ নাম গ্রহণ করেছেন কেন? এ জন্যেই তার ব্যাপারে অনুসন্ধানের কথা আমি বলেছি। হতে পারে, তার পরিচয় আরও আছে। হতে পারে, তিনি ঐ তিনজনের ব্যাপারে যা বলেছেন, গোটাটাই মিথ্যা।’ আহমদ মুসা বলল।

ড. মাহজুন মাজহার নীরব।

নীরব ডিজিপি মাহির হারুন এবং গোয়েন্দা অফিসারও।

গোয়েন্দা অফিসার কানে কানে কি বলল ডিজিপি মাহির হারুনকে।

মাহির হারুন বলল, ‘তাহলে তো স্যার আমার গ্রেফতার করতে পারি মিসেস গাজেনকে। গ্রেফতারের জন্যে যথেষ্ট দলিল আমাদের হাতে আছে। আমি সেই কথাই ড. মাহজুন মাজহার স্যারকে বলছিলাম।’

‘না মি. ডিজিপি, তাকে গ্রেফতার না করে তাকে ফলো করে তার সম্পর্কের সূত্রগুলো বের করাতেই লাভ বেশি। আমরা চাই তার পেছনে কারা আছে, সেটা জানতে। একসময়তো তাকে গ্রেফতার করতেই হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার, আমরা এটাই করব। তবে তার বিরুদ্ধে একটা কেস দায়ের...।’

ডিজিপি মাহির হারুনের কথার মাঝখানেই তার ওয়্যারলেস অস্থিরভাবে বিপ বিপ করে উঠল।

কথা বন্ধ করে ‘এক্সকিউজ মি স্যার!’ বলে সে ওয়্যারলেস তুলে নিল।

ওয়্যারলেস তুলে নিয়ে কথা কিছুটা শুনেই 'হোল্ড অন' বলে কলটাকে হোল্ড করে সে আহমদ মুসার দিকে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'স্যার, ঘটনা ঘটেই গেছে, মিসেস গাজেন নিহত হয়েছেন।'

'কোথায়?' দ্রুত প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

'স্যার, আমাদের পুলিশ তার বাড়ির চারদিকে পাহারা বসিয়েছে। তারাই জানাল, মিসেস গাজেন তার বাগানে কাজ করছিলেন, এ সময় গুলিতে তিনি নিহত হয়েছেন। বাগানের পাশে দাঁড়ানো একটা গাড়ি থেকে তাকে গুলি করা হয়। পরপর দু'টি গুলি করার পরই গাড়িটি পালিয়ে যায়।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'তার বাড়িতে আর কে আছে?' বলল আহমদ মুসা।

'একজন পরিচারিকা এবং একজন আয়া ছাড়া তার বাড়িতে আর কেউ নেই। পরিচারিকা বাড়ির কাজকর্ম করে আর আয়া রাঁধা-বাড়াসহ মিসেস গাজেনের স্টাফ হিসেবে কাজ করে।' বলল ড. মাহজুন মাজহার।

'মি. ডিজিপি, আত্মীয়ের পরিচয়ে বা অন্য কোন কথা বলে তার বাড়িতে লোক ঢুকতে চেষ্টা করতে পারে। তাদের বাঁধা দিতে হবে। কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়া যাবে না। আর আপনার পুলিশ বাড়িতে ঢুকে পরিচারিকা ও আয়াকেও গ্রেফতার করবে। দরকার হলে আরও পুলিশ যেতে বলুন সেখানে।' আহমদ মুসা বলল।

ডিজিপি তার ওয়্যারলেসের কল অন করে বলল, 'ওখানে এখন কি অবস্থা?'

ওপারের কথা শুনতে গিয়ে ডিজিপি মাহির হারুনের চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। কথা শোনার মাঝখানেই সে বলে উঠল, 'শোন, বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেয়া যাবে না। বাড়াবাড়ি করলে গুলি কর। লাশ ওখানেই এখন থাকবে। আর তোমরা কয়েকজন ভেতরে ঢুকে যাও। বাড়িতে পরিচারিকা, আয়া বা যাকে পাও তাকেই গ্রেফতার কর। ওখানে কতজন পুলিশ পৌঁছেছে? দরকার হলে আরও পুলিশ ডেকে নাও। আমিও বলে দিচ্ছি। ওকে। যখন যা হয় আমাকে জানাবে। বাই।'

কথা শেষ করে ডিজিপি তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘স্যার, আপনার কথা ঠিক। আত্মীয়ের পরিচয়ে কয়েকজন লোক এসেছে, তারা বাড়িতে ঢুকতে চাচ্ছে এবং লাশও হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। তাদের গ্রেফতার করলে কেমন হয়?’

‘এতক্ষণে ওরা চলে গেছে। বাঁধা পাওয়ার পর, পুলিশ বলে আঁচ করতে পারলে, এক মুহূর্তও আর তাদের থাকার কথা নয়। গ্রেফতার করলেও খুব একটা লাভ হতো বলে মনে হয় না। ওরা সম্ভবত ভাড়াটিয়া লোক হবে। আমার মনে হয়, ওদের পাঠানো হয়েছিল বাড়ি থেকে কম্পিউটার, ডায়েরি, নোটবই ইত্যাদির মত কিছু জিনিস নিয়ে যেতে, অথবা বাড়ির ঘরগুলো জ্বালিয়ে দিতে।’

কোন কথা না বলে ভ্যানের পুলিশ প্রধান ডিজিপি মাহির হারুন ওয়্যারলেস তুলে নিয়ে যোগাযোগ করল মিসেস গাজেনের বাড়িতে পাহারায় থাকা সংশ্লিষ্ট পুলিশের সাথে। সংযোগ হতেই সে দ্রুত বলল, ‘ওরা যারা বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল, তাদের কি খবর?’

শুনল ডিজিপি মাহির হারুন ওপারের কথা। ওপারের কথা শেষ হলে ‘ওকে’ বলে লাইন অফ করেই বলল, ‘স্যার, এবারও আপনি ঠিক বলেছেন। বাঁধা পাওয়ার পরই কিছু একটা সন্দেহ করেই দ্রুত ওরা পালিয়েছে।’

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল আহমদ মুসা। তখনই তার মোবাইল বেজে উঠে তাকে থামিয়ে দিল।

‘এক্সকিউজ মি’ বলে মোবাইল বের করল পকেট থেকে। মোবাইলের স্ক্রীনে কলারের নাম দেখেই মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। টেলিফোন করেছে তুরস্কের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রধান জেনারেল মোস্তফা কামাল, ইস্তাম্বুলের কাজে আহমদ মুসার সবচেয়ে বড় সাথী।

আহমদ মুসা কল অন করেই বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো জেনারেল মোস্তফা। কেমন আছেন?’

‘ওয়ালাইকুম সালাম। আমরা ভালো আছি। আমরা খুব খুশি হয়েছি, আমরা আপনাকে যেতে দিলেও তুরস্ক আপনাকে যেতে দেয়নি।’ বলল ওপার থেকে জেনারেল মোস্তফা।

'হ্যাঁ, সেটাই ঘটেছে জেনারেল। একজন বিপদগ্রস্ত মেয়ের আবেদন আমি উপেক্ষা করতে পারিনি।' আহমদ মুসা বলল।

'কি ঘটনা বলুন তো?' জিজ্ঞাসা ওপার থেকে জেনারেল মোস্তফার।

ড. আজদার ইন্টারনেট আপীলের বিষয়টা সংক্ষেপে জানানোর পর বলল, 'ড. আজদার বলা ঘটনাগুলো আমার কাছে খুব বড় ঘটনার আইসবার্গ বলে মনে হয়েছে। তাই ওদের পাঠিয়ে আমি ভ্যানে যাত্রা বিরতি করেছি।'

'যে সব রিপোর্ট এখানে পেয়েছি, তাতে বিষয়টাকে খুব রহস্যপূর্ণ ও বড় কোন বিষয় বলে আমারও মনে হয়েছে। আপনি তো সরেজমিনে আছেন। ব্যাপার কি বলুন তো?'

'আমি কাজ সবে শুরু করেছি। এখনও ঘটনার গভীরে যেতে পারিনি। তবে আমি ড. আজদার ইন্টারনেট থেকে যা আঁচ করেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল, আর্মেনিয়ার কুখ্যাত সন্ত্রাসী সংগঠন এর সাথে জড়িত। কেন জড়িত, কি চায় ওরা এ ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট নয় এখনও। এই মাত্র আমরা খবর পেলাম, মিউজিয়ামে ডাকাতির ব্যাপারে আমাদের সামনে এগোবার একমাত্র লিংক পারসনকে ওরা হত্যা করেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'বিষয়টা ওখানে খুব জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটা কথা আপনি বলুন, বিষয়টার সাথে কোন রাজনীতির গন্ধ আছে কিনা।' ওপার থেকে বলল জেনারেল মোস্তফা।

'খুব নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। তবে ওদের সকলের বাহুতেই মাউন্ট আরারাতের উল্কি আছে। আর আমি যা মনে করেছি, এদের গোড়া যদি আর্মেনিয়ায় থাকে, তাহলে এর সাথে ধর্ম ও রাজনীতি দুই-ই জড়িত আছে।' আহমদ মুসা বলল।

'এটা একটা খুব বড় ব্যাপার। আমাদের একটা অনুরোধ মি. খালেদ খাকান।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'বলুন মি. জেনারেল।' আহমদ মুসা বলল।

'আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে, আপনি ওখানে হাজির। আমাদের সবার অনুরোধ, ওখানকার বর্তমান বিষয়ে অনুসন্ধানের নেতৃত্ব আপনি নিন। ড.

আজদার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার চ্যাপ্টার তো আপনি দেখছেনই। এখন গোটা বিষয়টার দায়িত্ব দয়া করে আপনাকে নিতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয় নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথেও আলাপ করেছেন। রাজনৈতিক বিষয় জড়িত থাকায় বিষয়টি জটিল হয়ে উঠতে পারে। ইতোমধ্যে নিশ্চয় আপনি দেখেছেন, আমাদের পুলিশ ও আমলাতন্ত্রে কিছু কিছু প্রশ্নে সমস্যা আছে। এই তদন্তের ব্যাপারটা সে ধরনেরই একটি বিষয়।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'বুঝেছি জেনারেল মোস্তফা। আপনি যে সমস্যার কথা বললেন, সেটা আসলেই একটা বড় সমস্যা। ঠিক আছে, উল্কিওয়ালাদের বিষয়টা কি, সেটা দেখার আমারও একটা আগ্রহ আছে। আল্লাহ ভরসা।' আহমদ মুসা বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের বাঁচালেন মি. খালেদ খাকান। এখানকার আর্মেনীয় নাগরিক ও আর্মেনিয়া আমাদের জন্যে একটা মাথা ব্যথা। কিছু ঘটলেই এর সাথে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ যুক্ত হয়। সেই জন্যেই বিষয়টির নিশ্ছিদ্র ও গ্রহণযোগ্য তদন্ত প্রয়োজন।'

মুহূর্তের জন্যে থামল জেনারেল মোস্তফা কামাল। আবার বলে উঠল, 'ওখানকার পুলিশ ও প্রশাসনের সাথে আমরা কথা বলব।'

'এখানে ভ্যানের পুলিশ প্রধান ডিজিপি মাহির হারুন আমার সামনেই আছে।' আহমদ মুসা বলল।

'প্লিজ মি. খালেদ খাকান, ওকে একটু দিন। আমার পাশে পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনও আছেন।' বলল জেনারেল মোস্তফা ওপার থেকে।

'ওকে, দিচ্ছি।' বলে আহমদ মুসা তার মোবাইলটি ডিজিপি মাহির হারুনের দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'আংকারা থেকে সিকিউরিটি চীফ জেনারেল মোস্তফা কামাল কথা বলবেন।'

মোবাইল নিয়েই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আসসালামু আলাইকুম, স্যার আমি মাহির হারুন।'

তারপর ডিজিপি মাহির হারুন শুধু অবিরাম 'স্যার', 'স্যার' বলে কথা শুনতেই লাগল।

কথা শোনা শেষ হলে ডিজিপি মাহির হারুন মোবাইল আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল, 'স্যার, স্যাররা আপনার সাথে আরেকটু কথা বলবেন।'

ওপারের সাথে সালাম বিনিময়ের পর বলল, 'হ্যাঁ মি. নাজিম এরকেন, কেমন আছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, ভালো আছি মি. খালেদ খাকান। আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা আপনি গ্রহণ করুন। জেনারেল মোস্তফা আপনার সাথে আর একটু কথা বলবেন।' ওপার থেকে বলল তুরস্কের পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন।

'আচ্ছা দিন তাকে।' আহমদ মুসা বলল।

ওপার থেকে জেনারেল মোস্তফার কণ্ঠ শোনা গেল। বলল সে, 'ডিজিপি মাহির হারুন খুব সৎ ও দেশপ্রেমিক পুলিশ অফিসার। তার সহযোগিতা আপনি পাবেন। আর যখনি বলবেন, আমি ও নাজিম এরকেন ওখানে যাব।'

'কিন্তু সমস্ত কেসের সাথে আমার জড়িত থাকার বিষয় গোপন থাকতে হবে। ডিজিপি মাহির হারুন ছাড়া পুলিশের আর কেউ জানবেন না, এটা আমার শর্ত।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে, ডিজিপি মাহির হারুনকে এটা বলে দেব। আপনিও এটা তাকে নির্দেশ দিন।' জেনারেল মোস্তফা বলল।

'ঠিক আছে, এখনকার মত তাহলে কথা শেষ।' বলল আহমদ মুসা।

'ওকে মি. খালেদ খাকান, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘ জীবন দিন এবং তিনি যা পছন্দ করেন, সব নিয়ামত আপনাকে দিন। আসসালামু আলাইকুম।' কথা শেষ করল জেনারেল মোস্তফা।

আহমদ মুসা সালাম নিয়ে কল অফ করে দিল।

আহমদ মুসা কল অফ করতেই ডিজিপি মাহির হারুন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আপনার সাথে কাজ করার সৌভাগ্য আমার পুলিশ জীবনের বড় পাওয়া হবে স্যার। আপনার নির্দেশে সবকিছু চলবে স্যার।'

'বসুন অফিসার। এটা আপনার স্যারদেরকেও বলেছি আপনাকেও বলছি, আমি যে এই তদন্তে পুলিশের সাথে যুক্ত, এ বিষয়টা আপনি ছাড়া পুলিশের

আর কেউ জানবে না। আমি ভিন্নভাবে কাজ করব, পুলিশকে যখন যা করতে হয় আমি আপনাকে বলব।' আহমদ মুসা বলল।

ডিজিপি মাহির হারুন বসেই এ্যাটেনশন হয়ে বলল, 'ঠিক আছে স্যার। আমি বুঝেছি স্যার। স্যার, মিসেস গাজেন হত্যাকাণ্ড ঘটনার এখন কি করব স্যার?'

'আপনি চলে যান সেখানে। আইন অনুসারে যা করার তা করুন। আমিও আসছি। আমি মিসেস গাজেনের বাড়ি সার্চ করব। আমি যাওয়ার আগে বাড়ির কোন কিছুতে কেউ হাত দেবেন না।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা থামতেই ড. মাহজুন মাজহার বলল, 'এসব খুব বড় ও জটিল বিষয়। এ ব্যাপারে কিছু বলা বা করার যোগ্যতা আমার নেই। তবে, আলহামদুলিল্লাহ, খুব খুশি হয়েছি যে, তদন্তের ব্যাপারে সবাই সচেতন হয়েছেন। বিশেষ করে আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে এর সাথে যুক্ত করায় তার অসাধারণ বুদ্ধি ও শক্তির সাহায্যে আমরা সফল হবো ইনশাআল্লাহ। কিন্তু একটা কথা জনাব আবু আহমদ আব্দুল্লাহ। ইস্তাম্বুলে আংকারায় আপনি 'খালেদ খাকান', আর এখানে আপনি আবু আহমদ আব্দুল্লাহ কেন?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'নানা কারণে সত্য অনেক সময় প্রকাশ করা যায় না। ইস্তাম্বুল-আংকারা এবং এখানে সেটাই ঘটেছে। আসল পরিচয়টা গোপন করেছি স্যার। আপাতত তা গোপনই থাক, স্যার।'

'ঠিক আছে, যার মধ্যে কল্যাণ বেশি সেটাই হওয়া উচিত।'

'ধন্যবাদ স্যার!' বলে আহমদ মুসা একটু থেমেই আবার বলল, 'স্যার, এবার আমাদের উঠতে হয়।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আমার একটু বাইরে বেরুতে হবে।'

বলে উঠে দাঁড়াল ড. মাহজুন মাজহার।

আহমদ মুসারাও উঠে দাঁড়াল।

ভাড়া করা ট্যাক্সি।

ড্রাইভারকে মিসেস গাজেনের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে সীটে গা এলিয়ে দিয়েছে আহমদ মুসা। মিসেস গাজেনের চিন্তাই তার মাথায়।

গাজেনকে ওরা হত্যা করল কেন? মিসেস গাজেন যদি ওদের ভেতরের লোক হতো, তাহলে হত্যা না করে তাকে সরিয়ে নিত। তাকে হত্যা করা হয়েছে নিশ্চয় কোন কিছু ফাঁস হবার ভয়ে। তাহলে মিসেস গাজেনের সাথে তাদের কি সম্পর্ক ছিল? মিসেস গাজেনের নামের বৈশিষ্ট্য বলে যে, সে আর্মেনীয় অথবা আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত। জাতিগত কারণেই মিসেস তাদের সাহায্য করতো, না কোন আর্থিক সুবিধা নিতো সে, কিংবা সে কোন ভীতি বা ব্ল্যাকমেইলের শিকার ছিল কিনা।

যাই হোক, মিসিং লিংক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে কোন একটা কিছু তাদের দরকার। সাহিবা সাবিতের কাছে এই মাত্র জানতে পেরেছে, মিসেস গাজেনের লেখার অভ্যাস ছিল। মাঝে মাঝে ছদ্মনামে তিনি পত্রিকার মতামতের কলামে লিখতেন। আরেকটা বড় খবর জানা গেছে তার কাছ থেকে। মিসেস গাজেনের জীবন একটা ট্র্যাজেডি। প্রথম যৌবনে একটা ছেলেকে ভালোবাসতো সে। কিন্তু ছেলেটির কাছ থেকে সে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়। তারপর সে বিয়েই করেনি। এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মেয়েরা হতাশাবাদী অথবা প্রতিহিংসাপরায়ণা হয়। দেখা যাক, মিসেস গাজেনের ভাণ্ডার থেকে কি পাওয়া যায়। কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, এটা স্পষ্টতই আঁচ করা যাচ্ছে যে, মাউন্ট আরারাত ঘিরে অথবা মাউন্ট আরারাতের সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে একটা ষড়যন্ত্রের কুণ্ডলী দানা বেঁধে উঠছে। একটা নতুন বিপদ ঘনিয়ে আসছে আনাতোলিয়ার ওপর। কি বিপদ, কি সে ষড়যন্ত্র? এই অঞ্চলে, এই ভূ-খণ্ডে ষড়যন্ত্র নতুন নয়। কিন্তু পূর্ব আনাতোলিয়ার ওপর এবার এই ষড়যন্ত্রের ছোবল উদ্যত হয়েছে কেন?

আহমদ মুসার গাড়ি এসে মিসেস গাজেনের বাড়ির লনে প্রবেশ করল।

কিছু পুলিশ ছুটে এসে ঘিরে ধরল গাড়ি।

ডিজিপি মাহির হারুন ছিল কাছেই।

সে দ্রুত এসে পুলিশদের আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি একজন সিনিয়র সাংবাদিক। একে আমরা ডেকেছি। তিনি ঘটনা ও বাড়ির সবকিছু দেখতে ও জানতে এসেছেন। আমিই ওকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি।'

ওদিকে আহমদ মুসাও গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সালাম বিনিময় করল দু'জনে। তারপর ডিজিপি মাহির হারুন বলল, 'কিলিং স্পটটা আগে দেখবেন চলুন। এরপর ভেতরটা দেখা যাবে।'

বলে হাঁটতে লাগল ডিজিপি মাহির হারুন। তার সাথে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসাও।

পরবর্তী বই

বিপদে আনাতোলিয়া

কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Md Rashed
2. Meah Imtiaz Zulkarnain